প্রথম ভারবি সংস্করণ / ফাল্গুন ১৩৬৭ / মার্চ ১৯৬০

প্রকাশক
বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়
বুক ট্রাস্ট
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৩০/১বি কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
শ্রীরামগোপাল মাইতি
লক্ষ্মী প্রেস
১৫ সি পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অরুণ মিত্র
চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

যেহেতু পূর্বরাগ তারুণ্য এবং যৌবনের ধর্ম; সেই কারণে, বর্তমান কাব্যগ্রন্থের আরম্ভ হয়েছে 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন'র ধর্মীয় উপাসনা দিয়ে। নতুবা ঐ গ্রন্থের প্রকাশকাল মনে রাখলে, কাজটি নিয়ম বহির্ভূত।

যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন'র বেশকিছু কবিতা ইতিপূর্বে 'রাণুর জন্য' অথবা 'লখিন্দর' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, প্রশ্ন রাখতে পারেন, আমি কি একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করছি না ? আমার কৈফিয়ৎ, কবিতাগুলি ভিন্নগ্রন্থের অন্তর্গত হ'লেও, একই সময়ের রচনা। তাদের পুনরায় একত্রে মেশানোর যে ত্রুটি, সেজন্য এই সকল কবিতার ধর্মীয় উন্মাদনাই দায়ী, আমি নই।

ভারবি-র অসীম সাহস, আমার মতো একজন ব্রাত্য কবির রচনাকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ কবিতার হাটে বিকোতে চান।

সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরনের একটি কথা আছে ; যাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্যের কাছাকাছি, তাঁরা যত তাড়াতাড়ি মুখ বন্ধ করবেন, ততই শুভ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা

সূচীপত্র

মুখে যদি রক্ত ওঠে

ভিসা অফিসের সামনে

মহাদেবের দুয়ার

তৃণ তরঙ্গ রৌদ্রে / রাত্রি শিবরাত্রি

সামনে পাহাড়

সামনে ঐ-যে পাহাড় দেখছো ;
রাত্রি গভীর হলে
কোথায় সে যায় ?
শুধু প'ড়ে থাকে
কয়েকটি নীল পালক !

রোজ রাত জেগে আমি সে দৃশ্য দেখি ;
হঠাৎ আকাশ ঢেকে দিয়ে রূপকথার পক্ষীরাজ
চাঁদকে ছাড়িয়ে আরো দূরে, সাত সমুদ্র মুছে দিয়ে
শূন্যে উধাও !

ভোর না হতেই সে আবার ফিরে আসে
পাহাড়ের রূপ ধ'রে ।
মনেও হবে না নীল পাহাড়ের ডানার ছটফটানি
কখনো শুনেছে কেউ ?

মাতলামো

আসমানী ওড়নার মেঘজরি ঝলোমলো পরীর পাখার মতো
নীলমাখা সে

দেখেছি তাকে ;
কেঁপেছে আলতা-গলা সমুদ্দুরে, হেসেছে লালপলাশ-ছেঁড়া বাতাসে
দেখেছি তাকে ;
আবীরের মতো রাঙা কৃষ্ণচূড়ায়
কামনার চেয়ে কালো ঝড় হয়ে যায়
মাতালের দু-চোখের স্বপ্নের বন্যার মতন হৃদয় ছোটে নিরুদ্দেশে
দেখেছি আলতা-গোলা সে দেহের তল নেই, দেখেছি সমুদ্দুর
দু-চোখে এসে
ভেঙে দিয়ে গেছে সব ঘুমপাড়ানি
মাসি ও পিসির গান ; সুখতাড়ানি
কড়া নিষেধের ঘরে বন্ধ দুয়ার ধ'রে কী-যে জোরে ধাক্কালো সে !
আমার হৃদয় নীলে থরোথরো কেঁপে গেল, ভেসে গেল,
মিশে গেল লাল পলাশে ॥

পূর্বরাগ

বিকেলে দিঘির জল তুলে নিয়ে গিয়ে
দেখেছি মিলিয়ে
তার সাথে কথা বলা দু-দণ্ডের উপচানো সময়
তত ঠাণ্ডা কোনো জল নয় ।

তত বৃষ্টি কোনোখানে নেই
ঝরে যা দু-চোখে তার চোখ রাখলেই ;
কিংবা তার শরীরের আঙুলোছে এতটুকু ছোঁয়া
জানায়, হৃদয় কেন ধুয়ে যায় ভালোবাসলেই—

তখন অন্ধকারে ভেসে যেতে করি না পরোয়া।

এই তো সে এতটুকু মেয়ে, হাসে খেলে···
পৃথিবী বদ্‌লে যায় তবু তাকে একটু জড়ালে ॥

কামরাঙা ডালে

কামরাঙা ডালে দুপুর বেলায়
বোনের শরীরে আবীর মাখছে
ভাই টিয়া পাখি 'কামরাঙা ফল
কেমন মিষ্ট খেয়ে দেখ সোনা।'

'ছায়া নেবে, ছায়া নেবে গো!'—হাঁকিছে
পসারী বিকেল।
সারা দেহে তার
শীতল ক্লান্তি।···'ও বিকেল, তুমি
লক্ষ্মী ছেলেটি, এখানে এসো না॥'

ওঁরাও নৃত্যসঙ্গীত অনুসরণে

বাঁশবনের ঐ পাহাড়টিতে আগুন লেগেছে
মিতা গো! মেঘ করে গর্জন!
শিকার পেয়ে শিকারীরা অমনি ক্ষেপেছে
সাথী গো! মেঘ করে গর্জন।

২

ঐ দেখ রে, কোথা থেকে কাকটি এ:সছে
ঝিকিমিকি সোনার মতো পালক ঝরিয়ে;
পুবের দেশের সোনা নিয়ে পালিয়ে এসেছে
ধরা পড়ার ভয়ে এলো পালক ঝরিয়ে!

৩

কোথা থেকে উঠছে এ কালো মেঘেরা ?

বৃষ্টির ঝরঝরানি...

টুপটুপ চুপচুপ কোনখানে পড়ছে এরা ?

পূব দিকে দেখ ভিড় করে মেঘেরা ;

বৃষ্টির ঝরঝরানি....

টুপটুপ চুপচুপ পশ্চিমে পড়ছে এরা।

এ লাল পাগড়ি কার, দিলো ভিজিয়ে ?

বৃষ্টির ঝরঝরানি···

কার এ দীঘল চুল, বৃষ্টিতে উঠলো নেয়ে ?

আহা ! এ-যে সেই ছেলে ! হোথা লুকিয়ে ?

বৃষ্টির ঝরঝরানি···

ওহো ! এ-যে সেই মেয়ে ! কী-যে ওরা করে লুকিয়ে ?

'কী ক'রে পাগড়ি, আহা, নেবো শুকিয়ে ?'

বৃষ্টির ঝরঝরানি ··

'হায় রে ! কোথায় আমি এত চুল নেবো শুকিয়ে ?'

'শুকনো ঝোপেই, ওহো, নেবো শুকিয়ে।'

বৃষ্টির ঝরঝরানি...

'বুকের আগুনে, আহা, সব চুল নেবো শুকিয়ে।'

এলোমেলো শাড়িখানি ঠিক ক'রে নাও !

ছেলে, পাগড়ি বাঁধো !

ভেজা এলোচুল সাবধানে আঁচড়াও !

ছেলে, পাগড়ি বাঁধো !

মেয়ে ! এলোমেলো শাড়িখানি ঠিক ক'রে নাও।

ছেলে,পাগড়ি বাঁধো !

মেয়ে ! ঠিক ক'রে নাও !

পদ্মপাতায় শিশির

পদ্মপাতায় শিশির লেগে
পদ্মপাতায় শিশির। তার চেয়েও শীতল, মেয়ে
তোমার বুকে উপোসী গাল রাখা।

কিন্তু যখন মাস ঘুরবে
তিরিশ দিনে মাস। তোমার চুমায় অঙ্গ পোড়া
সইবে কি আর এক বিছানায় থাকা ?

পরধন্ গীতিকার অনুসরণে

এই মাটির মাদল থেকে কী মিষ্টি গান
তুমি নিয়ে আসো গো !
বলো, কেউ কি এমন গান আনতে পারে
এই দেহের মাদল থেকে মাটির ভাঁড়ে
যেন মধুর মতো, ওগো গাইয়ে আমার !

ওগো গাইয়ে আমার, নাও দু-হাত দিয়ে
নাও দু—হাতে জড়িয়ে নাও শরীর আমার,
আরো একটু...আরো !
ওগো, করো খেলা করো তুমি আমাকে নিয়ে
করো আমার শরীরে খেলা শরীর দিয়ে,
আরো, মাদলের মিঠে সুরে পাবে তুমি গান
মিঠে চিনির মতো !

২

যদি বেসেছো ভালো
জাগো, সময় এলো !
দেখ, বিছানায় পড়ে আছে হীরার আলো

দেখ, আমার চোখেও আলো ঝলমলালো !
তুমি কোরো না দেরি, মিঠে লগন এলো—
যদি বেসেছো ভালো ।

ওগো, পাহাড় বেয়ে
তুমি উঠতে থাকো ।
সেই উঁচুনিচু বাঁকা পথ দু-পায়ে মাখো ।
সেই পথের শেষেই আছে সুখের পাওয়া
এসো, তাড়াতাড়ি শুরু করো তোমার বাওয়া ।
তুমি ক্লান্ত যখন নেমে আসবে শেষে
এসো, শুয়ে পড়ো ঝর্ণার কিনার ঘেঁষে ।

আমি গেয়েছি কত
সেই 'করম'-গাথা ;
সেই নাচের বিভোল দলে জড়িয়ে যাওয়া ;
সেই গোল হয়ে হাতে হাত চাঁদের নিচে
ভালোবাসার গানে ভালোবাসতে চাওয়া ।
ওগো, দল বেঁধে বনে ফুল কুড়ানো ছলে,
জানি, আমিও ছিলাম সেই মেয়ের দলে,
সেই 'দাদারিয়া' মিঠে গান ঝড়ের মতো
আশা এই বুকে বাসা বেঁধে কেঁপেছে কত ।
তবু, তোমার সঙ্গে আজ এই যে বাওয়া
জানি, এর কাছে সব পাওয়া মিথ্যে পাওয়া ।

অকালবর্ষণ

টুপ টুপানি টুপ
কার কপালে টিপ ?
চুপ কর তুই, চুপ···
বুক করে ঢিপ ঢিপ !

ঝরঝরানি অঝোরে
কেন রে তুই কাঁদো রে ?
কে গিয়েছে রাগ ক'রে ?

ঝিরঝিরানি ঝরছেই, ঝরছেই
শিউলিগুলি কেমন যেন করছে !
বৃষ্টিভেজা আগুন রে,
হেমন্তে কোন ফাগুন রে ?

তিন পাহাড়ের স্বপ্ন

সাঁওতাল মেয়েদের গান।

পাহাড়িয়া মধুপুর, মেঠো ধূলিপথ
দিনশেষে বৈকালী মিষ্টি শপথ ;
'মোহনিয়া বন্ধু রে ! আমি বালিকা
তোরই লাগি গান গাই, গাঁথি মালিকা।

'আজো সন্ধ্যার শেষে খালি বিছানা ;
আমি শোবো, পাশে মোর কেউ শোবে না–
তুই ছাড়া এই দেহ কেউ ছোঁবে না।'...

সুরে সুরে হাওয়া তার মিষ্টি বুলায় ;
সাঁওতাল মেয়ে-কটি দৃষ্টি ভুলায়

দিন শেষ—ধুধু মাঠ—ধুধু মেঠো পথ
সাঁওতাল মেয়ে-কটি ছড়ালো শপথ !
হাওয়ায় হাওয়ার মতো তাদের শপথ !

২

(ধীরে মাদল)

আয় মিতেনী, আজ রাতে
চাঁদকুড়ানো মাঝ রাতে
আবছা আলোর কান্নাতে
মুখ রেখে তুই ঝর্ণাধারে আয় !
আয় জোয়ানের মন-জ্বালা
নাচ দিয়ে সই, গাঁথ মালা—
চুমুর গেলাস মদ ঢালা
দে ছুঁড়ে দে, তিন পাহাড়ের গায় ।

(জোরে মাদল)

আহা মাদল, মাতাল মাদল বাজছে তোরই জন্যে লো !
খুশির হাওয়া, পাগলা হাওয়া গান দিল রাজকন্যে লো !
আয়, কাছে আয়, মন দে লো !

৩

চোখ কেন তোর কাঁপছে মেয়ে
বুক কেন তোর দুলছে ?
গাল দুখানি লালচে, শরীর
সাপের মতোই ফুলছে ?
কাকে মারবি ছোবল লো ?
কোন্ ছেলে তোর কী করলো !
মাদল ভেবে কেউ কি তোকে
আজকে বাজালো ?
ফুল দিয়ে নয়, ফাগ ছড়িয়ে
বিকেল সাজালো ?
কেমন দিবি সাজা রে ?
আর যাবি না পাহাড়ে !

৪

এত গান আকাশে
এত গান বাতাসে !

সাঁওতাল মেয়েটির টিপ কপালে
ছেলেটি পেছন তবু নিলো কী-ব'লে ?
রাঙা ফুল মেয়েটির খোঁপায় জ্বলে
ছেলেটি বাজালো বাঁশি তবু কী-ব'লে ?

এত মদ আকাশে
এত মদ বাতাসে !

নেশা যেন ধ'রে যায় ছেলেটির বাঁশিতে
মনে হয় দোষ নেই ভালোবাসা-বাসিতে,
তবে চাঁদ স'রে যাও, যাও তা হলে...
'ও ছেলে, পেছন তুই নিলি কী-ব'লে ?'

'পথ ভুলে গেছি মেয়ে খিল্‌খিল্‌ হাসিতে ;
শোন্‌, কোনো দোষ নেই ভালোবাসা-বাসিতে।'

এত আলো আকাশে
এত আলো বাতাসে !

ঘুমের মধ্যে

ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম
শঙ্খচূড়ের কান্না :
'এ আনন্দ অসহ্য, বোন,
দিস নে লো আর, আর না।'

জেগে উঠলাম ; দেখতে পেলাম
আর-না-দেবার সুখে
কেয়া ফুলটি ঘুমিয়ে আছে
বিষধরের বুকে।

তোমার মুখ

আমার হাতের ওপর তোমার মুখটি
তুলে ধরলাম—
দেখলাম, আবেগে বোজা তোমার চোখ।··
দেখা হ'লো না।

কতবার বললাম তোমার কানে,
কানে কানে—
দেখলাম, রক্তলাজে ফিরিয়ে নেওয়া তোমার চোখ!··
দেখা হ'লো না।

তোমার খোঁপা দিলাম খুলে,
জড়িয়ে নিলাম আমার মুখে, চোখে, বুকে—
দেখলাম, পরমসুখে দু-হাতে ঢাকা তোমার চোখ।··
দেখা হ'লো না।

যাবার সময়
পার হয়ে যাচ্ছিলাম
একটি দুটি ক'রে সব-কটি সিঁড়ি।···
হঠাৎ ফিরে তাকালাম···
দেখলাম, চোখের জলে ভেজা তোমার চোখ!
দেখা হ'লো না।

মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ

মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ,
কুকুরের কান্না!
তোমার গভীর ঘুমের পাশে আমার রাত্রিজাগরণ।
অদ্ভুত, এই পৃথিবীতে জীবনধারণ।

দোল ও পূর্ণিমা

সর্বত্রই এক মুখ, রঙে রঙে একাকার কিশোর মিছিল
যেন একঝাঁক চিল
দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত হয়ে দিঘির ভেতরে
সূর্যের বলের মতো রঙের চেতনা নিয়ে ক্লান্ত খেলা করে।

সর্বত্রই এক ক্লান্তি! শোলোক ফুরুলে
চুলের আবির নিয়ে ঘুমায় স্বপ্নের শিশু ঠাকুমার কোলে
আকাঙ্ক্ষায় পুড়ে যায় রূপকথার নক্ষত্রের অদৃশ্য কপাল
একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল!

পিকাসোর জন্য

এই এক ছবি দেখি, দিন রাত দুর্বোধ্য আয়নায়
বিকেলের মতো এক ক্লান্ত নারী রহস্য বিতরে ;
কিংবা আমাদের মন আছে কিনা, অস্ফুট বার্তায়
প্রশ্ন শুনি যেন ; কিংবা যতটুকু এ হৃদয়ে ধরে
ততটুকু নিতে গিয়ে দেখি ছবি অগাধ গভীর
কোথায় যে নিয়ে যায় ? তারপর সকলি নিবিড়

চেতনা চেতনা শুধু ! এক ছবি বহু ছবি হয়
তখন কি ? তখনো কি নিরুত্তর কিছু প্রশ্ন থাকে ?
পৃথিবীর সব নিয়ে, তবু যেন সব পাওয়া নয়
এমনি অভাব ? ··যারা আয়নায় ক্লান্ত মুখ রাখে
তারা তো একটি মেয়ে ; তবু তারা কেমন ছড়ায়
সর্বত্র, সর্বত্র তারা অব্যর্থ অস্বস্তি রেখে যায়

চিলে ঘরে, রাস্তায়, এভেন্যুয়ে উদ্বাস্তু মিছিলে
অথবা প্রথম-প্রেম-গুঞ্জনে কি বিবাহসভায় ।

মুখোশ

কান্নাকে শরীরে নিয়ে যারা রাত জাগে,
রাত্রির লেপের নিচে কান্নার শরীর নিয়ে করে যারা খেলা,
পৃথিবীর সেই সব যুবক যুবতী
রোজ ভোরবেলা
ঘরে কিংবা রেস্তোরাঁয় চা দিয়ে বিস্কুট খেতে-খেতে
হঠাৎ আকাশে ছোঁড়ে দু-চারটি কল্পনার ঢেলা ;

এবং হাজারে কয় রান ক'রে আউট হয়ে গেছে
ভুলে গিয়ে তারা হয় হঠাৎ অদ্ভুত ।
যুবতীকে মনে হয়, হয়তো বা সেরে গেছে সকল অসুখ,
যুবককে মনে হয়, কোনো-এক রহস্যের দূত
কার যেন স্মৃতিমুখ পাঠায়েছে আমাদের মতো কোনো প্রণয়ীর কাছে ;
সুন্দর কি কুৎসিত জানি না, তবু জানি মার্চেন্টের মারে নেই এই সব খুঁত ।

কান্না'কে সরিয়ে রেখে দৈনিক কাগজ খুঁজি তাই,
যুবককে ভুলে যাই, যুবতীকে দূরে-দূরে রাখি ;
তারপর কোনোদিন যদি মনে হয়
দিনগুলি বাসি বড়ো বিবর্ণ একাকী
প্রেমিক কি উদ্বাস্তুর মতো এক সমস্যায় নিতান্তই মূর্খ হ'য়ে গেছে ;
আমার কি আসে যায়, তুড়ি মেরে এগজামিনে দিয়ে যাবো ফাঁকি ।

অথবা কবিতা দিয়ে সমর্থন জানাবো তোমাকে,
হে প্রেমিক, হে উদ্বাস্তু, তোমাদের দুঃখে আমি গ'লে হবো নদী ।
হে দিন, হে কালরাত্রি,
না হয় আগলাবো আমি তোমাদের দুর্দিনের গদি ।

তোমরা নির্বোধ হাতে স্মৃতিমুখ খুঁজে-খুঁজে প'ড়ে যাবে যখন অসুখে,
তোমাদের দুঃখে আমি ম'রে যেতে রাজি আছি—কারো দুঃখে মরা যায় যদি।

কী আশ্চর্য! সেই ছেলে আমার দর্শন শুনে তবু
অর্ধেক বিস্কুট ফেলে রেস্টোর‍্যান্ট থেকে
চ'লে গেল। সেই মেয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপনে ভিড়ে
ডুবে গেল, তারপর কী যেন বললো সঙ্গিনীকে?
মনে হ'লো হেমিংওয়ে মম্ নিয়ে ওদের বিবাদ
আজন্ম চলেছে যেন, বন্ধুত্বটা কোনোমতে আছে তবু টিকে!

হঠাৎ পড়লো চোখে কাগজের এডিটোরিয়াল,
আমেরিকা ভালো, চীন ভালো...
ট্রুম্যান পাঠাবে অন্ন আমাদের কাল:
হৃদয় জুড়ালো।
হে যুবক, হে যুবতী, পৃথিবীতে তোমাদের কতটুকু দাম?
কান্নাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় ফোঁটা দিয়ে গেলে আলো?

শিশুর কান্না

"...Not a drop to drink..."

হীরে মুক্তো পান্না—

আলো পাখির গান না?
কানামাছি এই রাতে
জ্বালছে বুকের মাঝটাতে
রাঙাপিদিম কান্না!

আস্তে রাণী, পাশ ফেরো
চমকে বুঝি উঠবে ও!
কাঁপছো কেন, হচ্ছে কি?
শুকনো বুকেই টানলে, ছিঃ!—
স্বপ্নভাঙা কি বিশ্রী!

রুটি দাও

হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশানো রুটি
তবু তো জঠরে বহ্নি নেবানো খাঁটি
এ এক মন্ত্র ! রুটি দাও, রুটি দাও ;
বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাও :
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশেরো স্বাধীনতা ।

শুধু দুইবেলা দু-টুকরো পোড়া রুটি
পাই যদি তবে সূর্যেরো আগে উঠি,
ঝোড়ো সাগরের ঝুঁটি ধ'রে দিই নাড়া
উপড়িয়ে আনি কারাকোরামের চূড়া ;
হৃদয় বিষাদ চেতনা তুচ্ছ গণি
রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মণি ।

বেহুলা-নাচানো স্বর্গ

অয়ি পদ্মপলাশলোচনা
তোর চোখে কি পড়লো ধুলো ?
যেন নীলাকাশ জুড়ে লাল মেঘ
আর মেঘে মেঘে ঝড় এলো

তোর কী হ'লো আজকে ললনা ?
কোন্ কুটিল ঐরাবত
দিল নীলোৎপলেও বেদনা
আহা, রাঙা হ'লো কোকনদ ।

নাকি নিয়তির বাঁকা তলোয়ার
নীল নয়নে দিয়েছে দাগ—
আঁকে ফুলে ফুলে তাজা রক্ত
তার শিলীমুখ অনুরাগ ?

এই নিশীথ-শিথিল নিদাঘে
ও কী কালবৈশাখী জ্বালা !
বুঝি পূর্বরাগের সোহাগে
নিলি নীলকণ্ঠের মালা ?

তাই অহিদংশনে জরোজর
তোর কম্পিত পয়োধরে
এত রঙবদলের ঘটা কি ?
দেখে ইন্দ্রেরো ভয় করে,

তুই তথাপি বেহুঁশ নটিনী ?
চার দেয়ালের বীক্ষণে
নখী নক্তচারীর ভিড়ে কি
ভয় লজ্জাও নেই মনে।

এ কী যৌন-জ্বরের জলসায়
তুই তনু দিলি অঞ্জলি—
হাসি কান্নার চুনি-পান্নায়
ছুঁড়ে দিলি ছেঁড়া কঞ্চুলী।

ও কী দেবতা অসুর জড়সড়
বোবা রক্তের কোলাহলে।
এই বেহুলা-নাচানো স্বর্গ ?
সে যে আগুনের মতো জ্বলে !

কবিতার জন্ম

শ্রাবণঘন বাদল রাতে আকাশে ঘরে কোথাও নেই আলো
প্রেমের রোগ নয়নে তার ঘুমের রোগ দেহে
ছেলেটি কাছে এলো।

মেয়েটি যেন রূপকথার তুষারে ঢাকা ধবলাগিরি পাথর
ছায়ার মতো মোমের আলো ধূপের মতো পুড়ে
অন্ধকার শরীরে তার ঢেলেছে কালজ্বর।
গিয়েছে নিভে মোমের আলো, শরীর থেকে নিয়েছে শুষে রাত
এখন সব, কাঞ্চনের জঙ্ঘা তার বরফ, মৃত
শঙ্খচূড় সাপের মতো শীতল তার হাত,
কক্ষ তার মেরুর দ্বীপ, স্পন্দহীন ফসলহীন স্তন
চেতনা তার আছে কি নেই, হৃদয় বুঝি ছিল—
ধবলাগিরি পাহাড়ে আজ ফসিল তার মন।

ছেলেটি কাছে এলো
অবাক হয়ে দেখে সে, আহা প্রেমের রোগ নয়নে,
ঘুমের রোগ দেহে—
সারা ঘরেই আলো ॥

সোনারচাঁদ ছেলে

ছিল এক সোনারচাঁদ ছেলে
হঠাৎ একদিন এনামেলের কানাভাঙা পাত্রটাতে ভ'রে
ঝাঁজালো তামাটে অনেকখানি মদ খেয়ে নিল সে।
ছেলেটি একদিন দেখেছিল, আজ যাকে দেখা যায় না,

রূপোলী জ্যোৎস্নার মদে ভিজানো কোন-এক মেয়ের শরীর—
স্নানের জলের মতো সে শরীর থেকে আলোর মদ গড়িয়ে পড়ছে ;
দেখে দেখে সে মদ ধরল, এনামেলের কানাভাঙা পাত্রটাতে ভ'রে
শুষে নিতে চাইল একটি মেয়ের গোটা শরীর ।
আজ সে রূপোলী জ্যোৎস্না নেই, কোন শরীর নেই, পিপাসা
নেই—
একাদশীর বিধবা আকাশকে জড়িয়ে ধ'রে বমি আর অন্ধকারে
মাখামাখি
প'ড়ে আছে একটা পাঁড় মাতাল ॥

রাত্রি-কে

আলোর সায়া দু-হাতে ছিঁড়ে ফেলে
এখুনি কেন নিবিড় হয়ে এলে ?
বলো, বলো,
শরীরে বুঝি শ্রাবণ এসে পড়েছে কেঁদে, বলেছে 'দ্বার খোলো ।'
এমন ক'রে কাঁদে কি, বোকা মেয়ে !
চোখে জল ঝরছে বুক বেয়ে ।
বলো, বলো,
শরীরে বুঝি এসেছে ঝড়, পড়েছে পায়ে, বলেছে, 'দ্বার খোলো ।'
তনুতে কথা গানের মতো বাজে,
মুখের কথা হারালো কোন্ লাজে ?
বলো, বলো,
শরীরে বুঝি মাতাল হাওয়া পাগল হয়ে বলেছে, 'দ্বার খোলো ।'

সময় ঝরিয়া পড়ে

সময় ঝরিয়া পড়ে নির্জন দুপুরে
যেখানে বসিয়াছিলে একদিন মুখোমুখি,
তোমার চুলের গন্ধ বাসি হয়ে ধুলো হয়ে উড়ে
ক্লান্ত ক'রে দিয়ে যায় যেখানে সূর্যের গান,
তোমার আমার সেই ছোট চিলে ঘরে।
সময় ঝরিয়া পড়ে শব্দ তার শুনি
আনমনে স্মৃতি থেকে চুমুগুলি তুলে এনে গুনি
কত তারা ?···তারপর সব গোনা হয়ে গেলে
চোখ মেলে আবার তাকাই ;
সময় ঝরিয়া পড়ে, শূন্য ঘর, কাছাকাছি কোনো ঠোঁট
কোনো চোখ নাই।

গোধূলি যাত্রা

মনের সারস হাঁটে
মন্থর সন্ধ্যায়
একাকী।
মনের সারস হাঁটে
একাকী।

যতদূর চোখ যায়
যতদূরে প্রাণ যায়
বালুচর...
বয়সের শ্রান্তির
বালুচর।
মন্থর সন্ধ্যায় হাঁটছে···
কোনোখানে নেই ঘর।

সময়ের গায়ে জ্বর,
ফাটা জিভে ছাইচাপা ঠোঁট দুটি চাটছে :
মনের সারস তবু হাঁটছে।

সামনে কী ?
শান্তি...
ক্লান্তির সামনে কে ?
শান্তি...
কবর খুঁড়ছে কারা ?
এই পোড়া বালুচরে
লোক নেই।
কোনো মুখ কারো দুটি
চোখ নেই।

এখানে জীবন নেই, মরণ সমঝে থাকে তফাতে
কোনো ভেদাভেদ নেই যোজনে ও ছ'হাতে।
পাখিনীর মায়া নেই
শিকারীর ছায়া নেই...

মনের সারস হাঁটে একাকী।
কেন যে সারস হাঁটে একাকী ?

প্রভাস

স্মৃতির বালুচরে মুখেরা ভিড় করে
কেন যে ভিড় করে ? আমি তো ক্লান্ত।..
এখানে নদীপারে গোধূলি গান ধরে
আকাশ নীলে নীল ; হৃদয় শান্ত ;

ঘুমাবো আমি তাই ঘুমপাড়ানী গানে
ভরেছে চরাচর মিলেছে প্রাণে প্রাণ
তবুও ভিড় করে ; মুখেরা ভিড় করে,
অতীতে এত জ্বালা ; কে আগে জানতো !

দোসর কেউ নেই, চাই নে মিতালিও
তবুও পিছু ডাকে বিদুর, পার্থ ।
কী হবে প্রেম দিয়ে, দেহের জ্বর সেও ;
রাধার মুখ তবু কেমন আর্ত !
ঘুমুতে চাই আমি মাটিতে বুক মেখে,
মরণ চাই আমি আকাশে মুখ রেখে ;
তবুও হাঁটে তারা—ক্ষুব্ধ বলরাম,
অন্ধ কুরুরাজ, কুরুক্ষেত্র ।

তোমরা ফিরে যাও । কোথায় দ্বারকায়
নারীর দেহমদে পশুরা লুব্ধ ;
কোথায় শিশুকেও জ্যান্ত ছিঁড়ে খায়
আহত নেকড়েরা ; এমনি যুদ্ধ !
কী হবে ঘুম থেকে সে-দেশে হেঁটে গেলে ?
সুদর্শন আমি দিয়েছি ছুঁড়ে ফেলে ।
এখানে এই ঘাসে হৃদয় ঢেকে নিয়ে
ঘুচাবো দ্বন্দ্বের জয়ের ক্লান্তি—
ব'লো না কথা পাখি, আস্তে ঝরো ফুল ;
ঘুমের রাত আসে । শান্তি, শান্তি !

বর্ষা

কালো মেঘের ফিটন চ'ড়ে
কালীঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো ।

সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় ক'রে
খিদের জ্বালায় হুগলি-গঙ্গাকেই
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধ'রে
বেহুঁশ প'ড়ে আছে।

আষাঢ় এসে ভীষণ জোরে দুয়ারে দিল নাড়া-
শীর্ণ হাতে শিশুরা খোলে খিল ॥

জীবনানন্দের মহাপৃথিবী

সেই পৃথিবী সূর্যস্বয়ম্বরা
জ্বলে এবং জ্বালায়
মিছেই পাগল প্রেমে সমর্পিত
আগুন যে তার মালায়।

চুয়াচন্দন, অবাক ভালোবাসা
হেলায় উপেক্ষিত,
সেখানে মেলে কালের স্থবিরেরা
অপ্রেমে দীক্ষিত ;

কিন্তু তারাই সময় হয়ে গেলে
যমকে প্রশ্ন করে
যদিও অনেক মানুষ প্রত্যহ
দ্বিতীয়বার মরে ॥

প্যারীর আগুন

এ কী অস্থির আগ্নেয় উল্লাস—
তোমার, আমার জীবনের হতাশায়
তিলে তিলে জমা গ্লানি,

হাঁটু গেড়ে ব'সে দিনরাত্রির ভিক্ষা ও প্রার্থনা
'রুটি দাও, রুটি দাও !'
অবশেষে এ কী অগ্নিগর্ভ কালবৈশাখী গান !

সে কী এলো, নবজাতক, জননী প্যারী ।   কী আবির্ভাব
স্বপ্ন তোমার !   প্রাণবসন্তে রাঙা গোলাপের কুঁড়ি !
রক্তের দাগে দাগে
জননীগর্ভছিন্ন এ-কোন শিশুর পাপড়ি মেলা !

চোখ মেলে দেখা যায় না এমনি আগুন ;
বাহু দিয়ে তাকে বাঁধব আলিঙ্গনে
তাও যে অসম্ভব !
তবু গান, এ কী অপরূপ গান গাইলো সে উন্মাদ
আর আমাদের ম্লান রাতগুলি দাউ দাউ জ্বলে উঠলো
মুখ দেখলাম আমরা পরস্পর ।।

কফিনের সামনে

সাদা বা কালো
কোন পাথর
এ কোন আলো
হৃদয়ে বা ।

অথবা নাচে
নীল সাগর
পাহাড় নাচে
হৃদয়ে বা ।

বুড়োর মন
কবরে যায়
যখের ধন
গভীরে চায়
জীবন তবু
প্রেম নাচায়
পাহাড়ে বা
কবরে বা ॥

প্রার্থনা : নদীর কাছে

আমি অনেক হৃদয় দেখলাম
তোমার মতো গম্ভীর কেউ না
আমি অনেক কবিতা জানলাম
তোমার পলিমাটির মতো না ।

তুষারে আমি ময়ূর নাচালাম
অবাক তারা তোমার মোহনায়,
পাথরে আমি প্রতিমা বানালাম
তোমার রূপে সহজে ধুয়ে যায় ।

এখন আমি দ্বিতীয় শৈশবে
তোমার কোলে তোমার স্তনে মা
অমল হতে এসেছি, অনুভবে
রাঙাবো ব'লে ভোরের চেতনা ।

আমাকে তুমি গভীরে নিয়ে চলো
শিখিয়ে দাও তোমার ভাবনা ॥

ভিসা অফিসের সামনে

দুটি মানুষ দুই পথে চ'লে গেল ;
যতক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়
ওরা অপেক্ষা করেছিলো ।

একজন অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলো,
আসি !
আরেকজন অনুভব করেছিলো সৎভাইয়ের যন্ত্রণা ।
দুটি কঠিন পাথরের মুখ
খোদাই করা
নিষ্প্রাণ দুই জোড়া ঘোলাটে চোখ
অদৃশ্য রক্তের তোলপাড়ে একই অধিকারে মৃত পিতাকে স্মরণ করেছিলো ।
আর এখন, এমন দিনে
যদি সে-মুখ আবার মনে পড়ে, রক্তে বাজে না-দেখার কঠিন ব্যর্থতা
তখন কোথায়, কোন রাস্তায় এসে দাঁড়াবে
দুটি সৎভাই ? সমস্ত আকাশটাই যেখানে দেয়াল দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা ॥

মায়ের মুখ

কোরাস । তবে কি মুখ তুষারসমুদ্র রে,
তবে কি আশা প্রস্তরের মায়া !

প্রথম । তেমন আলো কোথায় আমি পাবো
যে হীরা চোখে নবজাতক জ্বলে ?
তেমন ছায়া কোথায় আমি পাবো
স্বচ্ছ সেই কালোদীঘির শান্তি ।

কোরাস । তবে কি মুখ তিমিরসমুদ্র রে,
হায়, আমরা লবণজলে অন্ধ !

দ্বিতীয় । মায়ের মুখ দেখবো ব'লে আমি
প্রতীক্ষায় দীর্ঘরাত ধ'রে
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি ; মা
দেয়ালে আঁকা নিশীথিনীর মুখ ।

কোরাস । হায়, আমরা তুষারঝড়ে অন্ধ ;
কোথাও নেই ভাগীরথীর শান্তি !

তৃতীয় । মায়ের মুখ দেখবো ব'লে আমি
দ্বিপ্রহরে পাষাণ-মন্দিরে
পাগল হয়ে ঘুমিয়েছিলাম ; মা
মুখোশে ঢাকা কালোপাথর মুখ ।

কোরাস । কোথাও নেই ভাগীরথীর মুক্তি
আমরা এ কী চারদেয়ালে বন্দী ।

চতুর্থ । যন্ত্রণার এক তিমির থেকে
তিমিরতর আরেক কুয়াশায়
হয়েছি নতজানু ; আমার মা !
অমানিশার আলোয় মুখ রাখো ।

কোরাস । চারদেয়ালে এ কোন নিরাশা,
অন্ধকার দুয়ারে এ কী ক্লান্তি !

অনুভব

সমস্ত বিকেল, রোদ ধুয়ে দিয়ে বৃষ্টি চলে গেলে
বিবর্ণ সন্ধ্যার মুখ নৈঃশব্দ্যের থরোথরো ঘোমটার আড়ালে
কাকের কান্নার মতো অনুভব করা যায়, কবে কাক
আমাদের নাম ধরে ডেকেছিলো বলে ॥

মুখ তোলো, আমার প্রেমিক

চারদিকে কুয়াশা, আমি হৃদয়ের কান্নার তিমিরে
আর যেতে পারি না। আমি চেতনার মহানিশা ছিঁড়ে
ঘুমের স্বপ্নের মুখ আনতে পারলাম না, প্রেমিক
তুমি মুখ তোলো। অবচেতনার প্রেমে চতুর্দিক
আলো হোক। তোমার মুখশ্রী থেকে জেলে নেবো আনন্দ আমার।
কিন্তু মূর্তি নিরুত্তর, কালো পাথরের অন্ধকার ॥

অনেক রবীন্দ্রনাথ

বুকের গভীরে যাও
প্রেম স্বপ্ন মৃত্যুর নিঃশ্বাস ;
হাওয়া হও আমাদের রক্তের অমর
নিরাশ্রয় জ্ঞানের বিশ্বাস :

এক লক্ষ বছরের পর
রবীন্দ্রনাথের ছবি ইঁদুরের রক্তের ভিতর।
বুকের গভীরে যাও
যন্ত্রণার তিমির ভাবনা ;
হাওয়া হও আমাদের রক্তের অমর
নিরীশ্বর বোধের চেতনা :

এক লক্ষ বছরের পর
রবীন্দ্রনাথের গান ইঁদুরের আত্মার ভিতর !

২

এই যে মুহূর্ত যায়
কোথা
যেতে পারি মৃত্যুর গ্লানির রাজ্য
পার হ'য়ে, পিতা

তুমি মৃত ! আমার চেয়েও
অধিক নির্বোধ ব'লে আগে চ'লে গেছ
রবীন্দ্রনাথের মতো আর লক্ষ নির্বোধের ভিড়ে।
আমি আর এক মুহূর্তের
অণুমাত্র অংশ বেঁচে তোমার মতোই মূর্খ হব ?

৩

আমাকে একবার শুধু এক মুহূর্তের
অমৃতের স্বপ্ন দাও, পিতা !
আমি অবিশ্বাসে পুড়ে প্রত্যহ অঙ্গার
হওয়ার অসহ্য গ্লানি আর সইতে পারি না, আমার
বিশ্বাস ফিরিয়ে দাও।

কেন আমি ফসিলের চেয়ে
অধিক প্রস্তর হব, ধুলোর চেয়েও
অধিক নিশ্চিহ্ন ! এক লক্ষ বৎসরের
নদী পার হ'তে গিয়ে আমি ও রবীন্দ্রনাথ কেন
সে-দিনের পিঁপড়ের চেয়ে অকিঞ্চিৎ
স্মৃতির অতীত হব।

কেন আমি রবীন্দ্রনাথের মতো মৃত হব
আমি
বাঁচতে চাই, পিতা !
প্রস্তর যুগের শিশু মানুষের মতো এক অবাক বিস্ময়ে
বাঁচতে চাই চিরদিন বিশ্বাসের ধর্মের অমর।

কবিতা পরিষদের 'বইমেলায়'

আমরা সবাই চাঁদের আলোয় বামন
ব'সে আছি অনন্ত ইথারের
একটি বিন্দু কোটিতে ভাগ ক'রে
এই পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ ;
এবং ক'জন মার্কাস স্কোয়ারে।

আমরা সবাই ক্ষুদ্র ইতর বামন
চাঁদের আলোয় যে যার মুখ দেখে
অন্য সময় মাথার চুল ছিঁড়ি
আয়না ভাঙি ; তবু এখন অবাক
ঘাসের ওপর মার্কাস স্কোয়ারে ।

কবিতা শুধু কবিতা চারদিকে
যেন জীবন এখন কালপুরুষ
সপ্তর্ষি'র চেতনা : যেন চুমা
ইতর মুখে চোখে, ইতর বুকে ;
আধফোটা এই মার্কাস স্কোয়ারে ।

আমরা ক'জন সৌরলোকের বামন
কয়েকটি রাত বাঁশির মতো বাজি ।

তোর বুকের মধ্যখানে

ঈশ্বরের দয়া কাঁপছে ; ঊর্ধ্বে অধেঃ যেদিকে তাকাই
গানের অনন্ত আলো ; আলো তোর বুকের ভিতর ।
শিশুর মতন আমি জেগে উঠছি, গান শুনছি, আলো
চেতনায় নিচ্ছি ; আর সারা অঙ্গ আমারো ঈশ্বর ।

সারা অঙ্গ মন্ত্র হচ্ছে ; তোর বুকের মধ্যখানে আমি
দেখতে পাচ্ছি নবজন্ম, শুনতে পাচ্ছি শিবের নিঃশ্বাস ।
কোথাও সধবা নাচছে, নেচে উঠছে মৃত লখিন্দর ;
চন্দন নিমের গন্ধে ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত বাতাস ।

ঈশ্বরের দয়া কাঁপছে ; তোর বুকের মধ্যখানে আমি
চোখ রেখে, গাল রেখে, ঠোঁট রেখে একটি জীবন
মেষশাবকের মতো হয়ে যাব । কিশোর যিশুকে
দেখব আমি, জানব বেহুলাকে ; যুগ্ম করুণার স্তন

অনুভব করব আমি, গঙ্গা নামছে, দুই কূলে তার
শাখা নাড়ছে বোধিবৃক্ষ, মিলে যাচ্ছে এপার ওপার ।

জ্বর

কার যে যাবার সময় হ'ল, কে যে ঘরে এল ;
কিছুই জানি না ।
হাতপাতালের মায়ামুখের ছায়া এলোমেলো ;
কেউ কি আমার বোন এসেছে ?   কেউ কি আমার মা ?

দেয়াল জুড়ে টিকটিকিটা বিরাট ভয়ের মতো ;
হয়তো দেবে ঝাঁপ ।
ও যদি তার অনেক দিনের মুখের ছবিই হ'ত
ভুলত না কি সব অপরাধ, করত না কি মাপ ?

হাসপাতালে স্মৃতির হাওয়া আবীর খেলে খেলে
গেল ঘুমের দিকে ।
ভীষণ কালো মাকড়শা এক দিয়েছে জাল মেলে ;
বাঁধবে কি সে সৌরজগৎ, মুছবে কি রাত্রিকে ?

কোথায় যেন আধমরা এক বৃষ্টি প্রলাপ বকে
মাটির কোমর ধ'রে ।
কালির দোয়াত উলটে ফেলা নীল শেমিজের শোকে
মেঘের দেশে কেউ কি পাগল, কেউ কি মাথা খোঁড়ে ?

কার যে আসার সময় হ'ল, কে যে চ'লে গেল :
কোথায় ওদের ঘর ?
মাটির ওরা ; না কি মাটির অনেক নিচে এল ?
কান পেতে কি শুনতে পাব ফিসফিসোনি স্বর ?

মৃত্যুর পর, কুড়ি বছর

ভীষণ সব সর্বনাশগুলি
দেখতে হয় নি তোমাকে চোখ মেলে ;
জ্বলতে হয় নি ছেচল্লিশের যন্ত্রণায়, মার এবং মহামারীর
ভীষণ রোগ রক্তে নিয়ে
দেশ যখন সন্তানের হিংসা দ্বেষ, মায়ের দেহের মাংস নিয়ে
কাড়াকাড়ির নরক ।—
দেখতে হয় নি সাতচল্লিশে লুম্বিনীর চেয়ে ইতর
ভারত জুড়ে দেশভাগের উত্তেজনা।

এসব অভিজ্ঞতাব চেয়ে বিপরীত এক মানবতার আলোয়
তোমার জীবন সমারোহের মতন ছিল কবি ;
আমরা তখন স্বপ্ন দেখতে জেনেছিলাম ।

মাঝের কুড়ি বছর যেন নর্দমার স্রোতের ইতিহাস
পিপাসা, স্নান, জীবনধারণ সকলই অমানুষিক ।
সোনাগাছির বুড়ো বাড়িউলীর চেয়ে ভীষণ
মন্ত্রী, নেতা, অধ্যাপক, লেখক, ছাত্র, ভাদ্রমাসের কুকুর
এখন একসূত্রে বাঁধা স্বাধীন দেশে, আমাদের জীবনের
সকল স্বপ্ন এখন
ব্যবহারে নষ্ট হার্মোনিয়মে বাজা মাতাল রসিকতা !

দুঃস্বপ্নেও এমন সর্বনাশ
স্বাধীন জন্মভূমিকে নিয়ে ভাব নি তুমি কবি ;
মানবতার স্বপ্নে তাই অটল ছিলে ।

জন্মাষ্টমী ১৩৬৮

মানুষ আজো জাদুঘরের কাচে
ইতিহাসের কিরণ হয়ে আছে।
ভাদ্রমাসের কুকুর তাকে দেখে
মৃতদেহের মনুষ্যত্ব শেখে।

পৃথিবীতে মাটি নেই ব'লে
আজ আমরা চাঁদের প্রণয়
গাঢ়তর করতে যাব চ'লে
তার বুকের মধ্যে। লজ্জা, ভয়

পশ্চিম ও পূর্ব জার্মেনীকে
উইল ক'রে দিয়ে যাব। যদি
চাঁদ তার শরীরের নদী
মুক্ত করে; পৃথিবীর ফিকে

আর্তনাদে কী আসবে যাবে?
কংগোর, কিউবার, হাঙ্গেরীর
নষ্ট, পচা শবদেহের ভিড়
ইহুদীর দুঃস্বপ্ন কুড়াবে

কিছুদিন।··সব কোলাহল
ধুয়ে দেবে চাঁদের নির্মল।

আরেক নদীর অনুভব

প্রেরণা : বোরিস পাস্তেরনাক

কোরাস। এ-পথ তিমির ও-পথ অন্ধকার
খরতোয়া নদী, কোমর ভাঙা সাঁকোটা আগুনে জ্বলছে
তুমি হ'য়ো নদী পার।

তারপর কোন দেশে যাবে তুমি? কতদূর যাওয়া যায়
এ-পাড় তিমির ও-পাড় অন্ধকার
খরতোয়া নদী নির্মম নখে তোমাকে ছিঁড়তে চায়
তুমি হ'য়ো নদী পার।

হ্যামলেট। কোন পথে যাব আমি? নিয়তির তীরবিদ্ধ
সারা অঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা
দিয়েছি নদীতে ঝাঁপ শরীর জুড়াব ব'লে
কিন্তু কীর্তিনাশা পদ্মা আজ
সর্বনাশী! আমি একা। শরীরে মরণ নিয়ে
কৌশলীর সাঁতার জানি না
তারো পর অন্ধকার...মৃতদেহে আত্মা দিয়ে
ঈশ্বর, তোমার এ কী কাজ!

নিয়তি। কোথাও যেয়ো না তুমি, নদীর ভিতর
অপরূপ শান্তি আছে, নদীর ভিতর
মুছে যাও, মুক্তা হবে। যন্ত্রণার বীভৎস চেতনা
নিয়ো না সর্বাঙ্গে তুমি; নদী ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

হ্যামলেট। জীবন্ত মানুষ নিয়ে কোন খেলা খেলছ তুমি পিতঃ?
নদীর গহ্বরে মুক্তা, মৃত, এই তোমার আশ্চর্য!
এ কোন পৃথিবী গড়লে! পথ চলতে মানুষেরা ভীত
তুফানে ভেঙেছে সেতু; আমাদের যাত্রাভঙ্গে, দয়াময়,
তোমার ভাস্কর্য।

এ যদি নিয়তি, আমি তার আদেশ করব অস্বীকার
আমাকে প্রত্যয় দাও ! তুফানে প্রলয়ে আমি হব নদী পার ।

কোরাস । তারপর কোন দেশে যাবে তুমি ? কতদূর যেতে পারো
এ-দেশ তিমির ও-দেশ অন্ধকার
শুধু পথ হাঁটা, কোনো মাটিতেই আশ্রয় নেই কারো
তুমি হ'য়ো নদী পার ।

নিয়তি । সেখানে যুদ্ধ, কে জননী আর কে বন্ধু ভাই সকলেই বর্বর ;
জলের গভীরে গভীর শীতল শান্তি
প্রাণহীন দেখ নদীর গর্ভে মৃত মানুষেরা অপরূপ প্রস্তর
এখানে মৈত্রী, সকল ঝড়ের শান্তি ।

হ্যামলেট । পিতঃ, এই নিয়তি আমার
এ মৃত্যুর নদী
ডাকিনীরা হবে খেয়াপার
জননীও দুশ্চরিত্র যদি ।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে

চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
চলো আমরা সময় থাকতে যে যার দেশের জাতীয় পতাকা
চাঁদের দেশের সবার চাইতে উঁচু পাহাড়টার
চূড়ায় দিই উড়িয়ে, তার মাটিকে করি সোনার চেয়ে দামী !

পৃথিবীতে কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার ছ-ফুট জমি নেই ।
একটি পাখির বাসা গ'ড়ে তোলার মতো সামান্য আশ্রয়
একটি ঘাসের দাঁড়িয়ে থাকার মাটি
আজ আমাদের অতীত ইতিহাসের স্বপ্ন, ঠাকুরমার মুখের রূপকথা ।

মিছেই মানুষ বেতারে টেলিভিসনে সাংবাদিকের গোলটেবিল বৈঠকে
পরস্পরকে নিন্দা করার উজ্জ্বলতায় নিজের মুখ দেখতে চায় আলো
মিছেই মানুষ নিজের দেশের নিজের দলের গর্ব করে।
আসলে তার পায়ের নিচে কোথাও আর মাটির কোন চিহ্ন নেই
ছ-ফুট জমি মেপে নিয়ে যেখানে উপনিবেশ গড়া যায়।

চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
সময় থাকলে সোনার চেয়ে মূল্যবান চাঁদকে দিই জাতীয় সংগীত।
অতঃপর চাঁদ ফুরোলে, ঠাকুরমার শোলোক শেষ হলে
আবার আমরা নতুন অঙ্ক কষব, শনি বৃহস্পতি মঙ্গলের ভূমি
অগস্ত্যের মতো আমরা শুষে নেব, শান্তিকামী মানুষ ;
বেঁচে থাকতে ছ-ফুট জমি চাই।

কবির সভায়

যতক্ষণ আলো ছিল
মুখগুলি চেনা যেত, যতক্ষণ
অন্ধকার এমন ভীষণ
গভীর ছিল না।

অথবা মুখোশ সব মুখোশ দেখেছি
সভার আলোয়। অন্ধকার হয়ে এলে
ছদ্মবেশ ছেড়ে ফেলে
সবাই গিয়েছে ঘরে। নিরাপদে। আমি একা অবোধ বালক।

অন্ধকার বুকের মধ্যে

তোদের মুখের ভালবাসায়
আমার মন ভরে না রে ।
আমি তোদের বুকের মধ্যে ঘুমুতে চাই
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে নয় ।

আমি তোদের বুকের মধ্যে জেগে উঠতে চাই
তোদের মুখের কথা শুনতে নয় ।

'জুলিয়াস সীজার' : মনে রেখে

ভিতরে আরেকজন আছে
সে দেখেছে ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলি :
রাজপথে সিংহীর প্রসব, পূব ও পশ্চিমে রক্ত
উত্তরে দক্ষিণে রক্ত ; ভয়ঙ্কর জন্মের চিৎকার
আত্মার ভিতরে আরেকজন
শুনতে পেয়েছে ।

বাজারের মধ্যখানে একটা নিশাচর পেঁচা
দ্বিপ্রহরে ভীষণ কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল ;
আর মৃত মানুষেরা কবরখানার মধ্য থেকে
সবাই বেরিয়ে এল আইনসভার আনাচে কানাচে ;
তাদের শরীর থেকে পুঁজ আর ঘৃণা আর দ্বেষ
চারদিকে ছড়াতে লাগল ।

সেই সঙ্গে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে
রক্তবৃষ্টি, অশরীরী প্রেতের গর্জন, হত্যা, আর্তনাদ ;

সেই সঙ্গে একলক্ষ বলির পশু রক্তের ভিতরে স্থির
হতে না-হতেই
দেখা গেল একজনেরও হৃৎপিণ্ড নেই।

ভিতরে আরেকজন আছে,
সে আজ বাইরে যেতে বারণ করেছে।

উদ্বাস্তু

বের করো তেমন সুরা, মুক্তাভস্ম, গোলাপী আতর
যাতে নেশা লাগে, আমরা নেশা করতে এসেছি এখানে।
দেখাও গোখরো কিংবা শঙ্খচূড় বুকের ভিতর
কী ক'রে ছোবল মারে, কালনাগিনী কত খেলা জানে।

আমরা প্রেমের অভিজ্ঞতা পেতে ঘর ছেড়ে এসেছি ;
যদি তাতে রক্ত লাগে দোষ নেই ; যদি লাল চোখে
মনে হয় এই সভা অন্য জন্মে নরকে দেখেছি,
যদি বুক কাঁপে, আমরা বেশি ক'রে ভালবাসব তাকে।

বুক থেকে একটি টানে ছিঁড়ে ফেলো রেশম কাঁচুলি
বিষ-মাখানো যুগ্মস্তন মুক্ত করো, চাঁদের কুয়াশা
জ্বলুক হীরার মতো নগ্ন দেহে, যাতে আমরা ভুলি :
এসো, বুকে বুক রেখে জ্বলতে জ্বলতে মিটাই পিপাসা।

যে ঘরে ছিলাম আমরা, পুড়ে গেছে ঈর্ষায়, অপ্রেমে ;
আমরা হত হতে রাজী, কিন্তু প্রেমে, রমণীর প্রেমে।

শীত

পাতা ঝরছে, গাছের পাতা ঝরছে, গাছের পাতা ঝরছে
আমলকী আম কামরাঙার পাতা ;
যাদের দাতা বৃক্ষ ব'লে বুকের মধ্যে জেনেছিলাম
তাদের সকল গেছে, তারা সব হারিয়ে রাস্তার ভিক্ষুক।

এখন দয়া মায়া ভালবাসা সবাই ভিক্ষা করবে
পথে পথে, এখন বুকের রক্ত মুখে উঠবে, এখন
পাতা ঝরছে, গাছের পাতা ঝরছে, এখন হাত পাতলে
চোখের জল, শুধু চোখের জল

আর সব শব্দ

ভয়গুলি ঘুমের মধ্যে
আলো জ্বালে
ঘণ্টা বাজায়
কী যেন প্রার্থনা করে!

আমরা অনেক দিন
ক্ষুধার রাজ্যে নতজানু,
তারপর সইতে না পেরে
নিদ্রিত ছিলাম।

ভয়গুলি শ্মশানযাত্রীর মতো
নাকি কোনো মন্দিরের পুরোহিত,
অথবা কোথাও কোনো বিবাহ এখন
তার আর্তনাদ!

আমরা ক্ষুধার রাজ্যে যে-কোনো শব্দের মধ্যে
এখন প্রার্থনা থেকে মন্ত্র
মন্ত্র থেকে পবিত্র আগুন
পবিত্র আগুন থেকে মৃত্যু হতে পারি।

কিন্তু ভয়গুলি—
ঘুমের মধ্যে তারা আর সব শব্দকেই
ঢেকে দেয়।

নষ্ট চাঁদ

সমুদ্র যখন ফুলে ফেঁপে উঠল
বাতাস যখন
ভয়ংকর গর্জে উঠল, আর দশ দিক
অন্ধকার, আর অন্ধকার ছিঁড়ে ত্রিভুবন জ্বলল যখন
বজ্রের আলোয়;
ঠিক তখন ভেসে উঠল দুর্গন্ধ দূষিত মৃতদেহগুলি
ঘৃণায় যাদের থেকে দূরে ছিল এমনকি হাঙর, কুমির।
২
সপ্তর্ষিকে ক্রমেই ঢাকছে মেঘ
ভালো ক'রে উত্তর আকাশ
দেখা যায় না আর।

মাথার ওপর কালপুরুষ
আবছা ছায়ার মতো মনে হয়;
তার এক পাশে
অস্তমিত বৃহস্পতি যেন কোনো বিষণ্ণ আত্মার
দীর্ঘশ্বাস।
আর কিছু দেখা যায় না, আর সব অন্ধকার, সব অন্ধকার।

অনেক প্রাচীন যারা প্রপিতামহের প্রপিতামহ, অথবা
তার প্রপিতামহের...বিশ্বামিত্র মুনি কিংবা যমের সঙ্গে যারা
অশ্বমেধ যজ্ঞে রবাহূত হয়ে, ঝলসানো মাংসের গন্ধে, সোমরসের পিপাসায়
এ-ওর গলা জড়িয়ে গান গাইত, মাতলামোর গান গাইত :
'কে কার তোয়াক্কা রাখে, কে কাকে ?'

কয়েক বোতল রম কিছু ছোলাভাজা সঙ্গে নিয়ে
ঘুম থেকে তাদের তিন ধাক্কা মেরে তুলে দিতে চাই।

৪

উন্মাদ হ্যামলেট, আহা উন্মাদ ওথেলো !
বাইরে বড় ভয়ংকর ঝড় !
একফোঁটা বৃষ্টির জন্য কারা যেন কাঁদিছে, কারা যেন
মাথা খুঁড়ছে ; উন্মাদ লিয়র !

৫

যে জ্যোতিষী আমার লগ্নে চাঁদ দেখতে পেয়েছিল
যে জ্যোতিষী আমার লগ্নে চাঁদ
হায় রে হায়, দেখতে পেয়েছিল
তাকে আমি রম খাওয়াব. সে যে আমার ইয়ার
রমের সঙ্গে পাঞ্চ করব বিয়ার
রম এবং বিয়ার

যদি সে না পালিয়ে যায়। পালিয়ে যেতে পারে ?
হা রে রে রে রে রে !
কোথায় পলাস ভাইটি আমার, লক্ষ্মী ছেলেটি ;
আমার লগ্নে চাঁদ দেখেছিস না ?

চাঁদের সঙ্গে আর কী ছিল, চাঁদের সঙ্গে আর কী ছিল···
এবার ব'লে যা !

মুখে যদি রক্ত ওঠে

মুখে যদি রক্ত ওঠে
সে-কথা এখন বলা পাপ।
এখন চারদিকে শত্রু, মন্ত্রীদের চোখে ঘুম নেই ;
এ-সময়ে রক্তবমি করা পাপ ; যন্ত্রণায় ধনুকের মতো
বেঁকে যাওয়া পাপ ; নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা পাপ।

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,
প্রার্থনায়, সারারাত।

মাইকেলের সমাধি

জল থেকে, মাটি থেকে পাথরের অন্ধকার থেকে
বিষফুল ছিঁড়ে আনব ;
পুরুষ নামের যত ফুল ফোটে রুক্ষ ও কঠিন
তোমার ঘুমের ঘরে প্রণামের মতো রাখব।

লাবণ্যের মতো নাম যে-সব ফুলের
রমণীর মতো নাম যে-সব ফুলের
করুণার মতো নাম যে-সব ফুলের
সে-সব শান্তির ফুল হাতে ক'রে
সারকুলার রোড দিয়ে পথ হাঁটতে আমার হৃদয়
সাড়া দেয় না।

কাঁটা, সাপ, নরকের বমন মাড়িয়ে
তীব্রজ্বালা যদি কোন ধুতুরা, অর্কিড
একদিন বুকে ক'রে আনতে পারি ;
পাষাণপুরীতে আমি তোমাকে প্রণাম করতে যাব ।

ফুল ফুটুক, তবেই বসন্ত

প্রেমের ফুল ফুটুক, আগুনের
মতন রং ভালবাসার রক্তজবা
আগুন ছাড়া মিথ্যে ভালবাসা
এসো, আমরা আগুনে হাত রেখে
প্রেমের গান গাই ।

আলো আসুক, আলো আসুক, আলো
বুকের মধ্যে মন্ত্র হোক : রক্তজবা ।
এসো, আমরা আগুনে হাত রেখে
মন্ত্র করি উচ্চারণ : 'রক্তজবা !'

এসো, আমরা প্রেমের গান গাই ।।

রূপসী বাংলা

চোখের জল শুধু চোখের জল
চুমার দাগগুলিকে ধুয়ে দেয় ;
তুমি মিছেই বুকে টেনেছ, তার মুখ
চোখের জলের সাগর ।

বরং আঁধার

হৃৎপিণ্ডের মধ্যখানটা
যেখানে স্বদেশ মন্ত্র ছিল
এখন রক্তে একেবারে রাঙা
কারা যেন ছুরি উঁচিয়ে ছিল।

নজরুল! তুমি দেখতে পাও নি
জন্মভূমির এই যন্ত্রণা,
দেখলে আবার উন্মাদ হতে...
বরং আঁধার অনেক ভাল।

এই অন্ধকার

নিঃশ্বাস নিতেও মানা
কেন না মানুষ এই অন্ধকারে নিজের মুখ-কে
লুকিয়ে রাখার জন্য
চারিদিকে কশাইখানার মধ্যে
ছ'ফুট মাটির নিচে চুপচাপ স্থির ব'সে আছে।
কোথাও জানলা নেই
দরজার কথা ভাবা অসম্ভব,
কেননা বাতাস ঢুকলে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান
হতে হবে। কেন না ঘরের মধ্যে, ঘরের বাইরে
অন্তহীন দ্বেষের আগুন।

বন্ধুর হাত

স্পর্শ করলে পুনর্জন্ম হতে পারে
কিন্তু মাঝখানে
বাতাসের শূন্যতা, চোখের জল ঝরে
যেন শীতের হলুদ পাতা ॥

একটি আত্মার শপথ

ভ্রাতৃহত্যার প্রতিরোধে নিহত আমীর হোসেন চৌধুরীর
স্মৃতিতে নিবেদিত

'মারতে জানা যত সহজ
মরতে জানা তত সহজ নয়,
তাই কি ভাবিস? তাই কি দেখাস ভয়?

এইটুকু তো বুকের মণি
তাকেই আবার টুকরো করা চাই ?
ভুলেই গেছিস, ওরা আমার ভাই !

মারতে জানা সত্যি সহজ
মরতে জানা আরো সহজ যে,
নে রে মূর্খ ! আমার জীবন নে !'

এই ব'লে সে চ'লে গেল, রক্তে ভাসা বুকের মণি তার
কাঁপিয়ে দিল বুড়িগঙ্গার ভাগীরথীর পাষাণ
অন্ধকার ॥

ভুবনেশ্বরী যখন

ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে
একে একে তার রূপের অলংকার
খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে
তিন ভুবনকে ঢেকে ;

সে সময়ে আমি একলা দাঁড়িয়ে জলে
দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ, যায়
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নিরুদ্দেশে
দেখি আর ঘুম পায় ॥

সারারাত শান্তির প্রার্থনা

শ্যামলী মেয়ের সারা অঙ্গ বেয়ে
বৃষ্টির অঝোর ধারা
কান্না-ধোয়া গানের শীতল স্পর্শ,

সারারাত শান্তির প্রার্থনা ॥

চোখের জল

চোখের জলে গিয়েছে ধুয়ে কালো
এখন শুধু আলো ছড়ায় সোনার মেঘগুলি
এখন নীল আকাশ, শুভ্র পাখিরা যায় নীড়ে ।

চোখের জল, আহা রে, ভালবাসার চোখের জল !

পোকায় খাওয়া মানুষের বুকে

ছোট্ট মেয়েটি খিলখিলিয়ে
হাসছিল বুকের মধ্যে ;
আর আমি অবাক বিস্ময়ে
নিজেকে দেখছিলাম !

তাহলে এখনো জায়গা আছে ; এখনো বুকের মধ্যে
একটি শিশুর মাথা রেখে
হেসে উঠবার মতো আলো হাওয়া, এইসব আছে ।
আমারই বুকের মধ্যে এই দৃশ্য
ভাবাও যায় না ।

কোথাও মানুষ ভাল রয়ে গেছে

কোথাও মানুষ ভাল রয়ে গেছে ব'লে
আজও তার নিঃশ্বাসের বাতাস নির্মল ;
যদিও উজীর, কাজী, শহর-কোটাল
ছড়ায় বিষাক্ত ধুলো, ঘোলা করে জল

তথাপি মানুষ আজো শিশুকে দেখলে
নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে,
উপোসেও রমণীকে বুকে টানে ; কারও
সাধ্য নেই একেবারে নষ্ট করে তাকে।

মহাদেবের দুয়ার

৪

গাছতলায় ঐ যে মানুষ
উপোস জানে না ;
উপোস জানে না বলে জঠর-জ্বালায় তিলে তিলে
'হা অন্ন, হা অন্ন' ব'লে
গাছের ছায়ায় তবু দাউদাউ জ্বলে যাচ্ছে।

যদি সে উপোস জানতো
তার জন্য প্রতিদিন সোনার থালায়
পরমান্ন আনতো সুজাতা।

কিন্তু সে সন্ন্যাসী নয়, সাধারণ নির্বোধ মানুষ।

৫

চন্দন শুকায়ে যায় কান্নার শরীরে
কে যেন বৃষ্টিতে ডাকে 'সখি রে! সখি রে!'
কে যেন কেবল ডাকে 'আহা রে, আহা রে!'
শুকায় চোখের জল আর জ্বর বাড়ে।

৯

আমি কোনোদিন
শুনি নি বেশ্যার কান্না, দেখি নি দুয়ার দিয়ে
দাগী চোর, খুনী আর জারজ সন্তানদের
বিবর্ণ মুখের আলো

আমি কোনোদিন
তাদের পাপকে চুমা খেয়ে, তাদের পায়ের নিচে মাথা রেখে
হই নি অমল।

আমি কিছুই শিখি নি এ জীবনে শুধু ঈর্ষা, ঘৃণা আর
কবির কলহ ছাড়া।

১০

মৃত্যু এসে চোখ অন্ধ ক'রে
সামনে দাঁড়াবে;
আর সব আবছা —নাম, মুখ, চুমুগুলি।
হলুদ পাতার মতো ঝ'রে গেছে।

এখন আগুন চারদিকে, মৃত্যুর মুখের
উজ্জ্বলতা, গম্ভীর নির্দেশ;
'নিঃশ্বাস নিও না, আর নিঃশ্বাস নিও না, আর নিঃশ্বাস নিও না।'

১১

জল বাতাস মৃতদেহের সোনা
কোটি বছর ধ'রে
এ এক খেলা; পাথরে তার ছাপ পড়েছে;
কোটি বছর ধ'রে

জীবন নাচে কান্নার প্রস্তরে।

১২

জলভরা মেঘগুলি
ফেটে পড়ে হাহাকারে,
আহা রে !
বাজ পড়ে আর বিদ্যুৎ চমকায় ;
মিলতে জানে না কান্নার মেঘগুলি ।

১৩

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধ'রে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম

যেই গাছ ফুল ফল ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে
পাখিদের ক্ষুধা মেটে ;

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম !

১৮

যারা কথা বলছে তারা বোবা
যারা শুনছে সকলেই
জন্ম থেকে বধির । অথচ
সভায় মিছিলে তিলধারণের ঠাঁই নেই ।

যারা উপস্থিত তারা বহুদিন মৃত
কিন্তু সকলেই হাততালি দিচ্ছে
কী জন্য এবং কাকে একজনও জানে না ।

২০

তুলসীতলায় ফুটে আছে একটি রক্তজবা
শান্ত গাছের পাতাগুলি অনেক নিষেধ করেছে তাকে
এমনভাবে বুকের বসন খুলে রাখতে ;
কেন না ঝড় উঠলে তখন আগুন মনে হবে ।

২১

অঝোরে নেমেছে বৃষ্টি
মধ্যরাতে
জ্যোৎস্নার সর্বাঙ্গ ঘিরে
কালো মেঘ আর স্মৃতিগুলি
কান্নায় আলোয় অন্ধকারে
নিরাশ্রয়

চারদিক গভীর তমসা মনে হয়
অথচ আলোর নদী প্রবাহিত, অথচ পাষাণ
গলেছে, বিধবা রাত্রি
অঙ্গের বসন ছুঁড়ে দিয়েছে দীঘির জলে

কিন্তু তার জল ভরবার কলস হারিয়ে গেছে।

২২

আগুন যখন
আকাশে ফণা ধরে, তার নাচ দেখতে
দেবতা আর অসুর হয় জড়ো ;

খিলবন্ধ ঘরের নিচে
বিরাট একটা রাস্তা খুঁড়ে, পাণ্ডবেরা
তখন যায় নিরুদ্দেশে।

২৩

মুখমণ্ডলে যতক্ষণ
রক্তের উচ্ছ্বাস থাকে
ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের
সহোদর !

তারপর
মুখ থেকে রক্ত চ'লে গেলে
পশুর সামনেও আমরা নতজানু হই
অন্নহীন, বিবর্ণ স্বদেশে।

২৫

অন্ধকারে দেখা যায় না
তবু
অনুভব করা যায়
চোখের জলের নদী প্রবাহিত
এইখানে।

পরিত্যক্ত মৃতদেহগুলি
হঠাৎ বাতাসে
কেঁপে ওঠে, আর
শূন্য বেহুলার ভেলা ভেসে যায়
নরকের দিকে, দারুণ দুর্ভিক্ষে,
অসহায়।

২৯

কেই নেই ছুঁড়ে দেবে একটি আধুলি কিংবা সিকি
একমুঠো চাল, এক টুকরো রুটি ;
কেই নেই বলবে, 'মাপ করুন, কিছু নেই।'

সকলেই ঘর অন্ধকার ক'রে থাকে, এমনকি হাওয়াকে
তারা আসতে দেয় না।

৩০

শুয়ে আছে দেবশিশু
তার ঠাণ্ডা বুকের মাঝখানে
শীর্ণ রক্তধারা

যেন প্রার্থনার মৃদু ঘণ্টা বাজে
মন্দিরে যখন সূর্য অস্ত যায়
আলো নিভে আসে

একমুঠো ভাতের জন্য ;
আর হরিধ্বনি শোনা যায়
সন্ধ্যার শ্মশানে !

৩৩

কান্নাগুলি যখন তাদের
এতদিনের বাসি কাপড় ছেড়ে
পরেছে লাল গরদ, আর চোখের জল
আগুন হয়ে ছুঁয়েছে আকাশ ;

তখন শেয়ালের কণ্ঠে প্রেমের গান,
তখন সাপের মাথায় মানিক জ্বলে।

৩৪

সন্ধ্যায় শ্মশানে হরিধ্বনি
শোনা যায় গায়ত্রী মন্ত্রের মতো
যেন ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বরে অন্ধকার কেঁপে ওঠে
আর কান্নাগুলি যে-যার চোখের জল মুছে স্থির হয়।

৩৬

কে জানে অমৃত কতখানি
উপচে পড়েছে পানপাত্র থেকে।

সারারাত ঘুমোতে পারি নি
তবু স্বপ্ন দেখেছি, একটা ঘর, কিন্তু
এক হাত থেকে
অন্য হাতে তৃষ্ণার গেলাস ভ'রে দিতে গেলে
অসীম শূন্যতা !

৩৭

একটি নষ্ট পচা ফলের জন্য
ভিক্ষুকেরা সবাই হাত বাড়ায়,
'আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমাকে'...
যেন আগুন লেগেছে ঐ পাড়ায়।

ফলটি ছ‍ু‍ঁড়ে দিতেই বাধলো দাঙ্গা,
ভিক্ষুকদের খুনোখুনি থামায় কে ?

৩৯

মানিক জ্বলে মানিক নেভে
সাপের মাথায়
অবাক আলোর ভালোবাসা
এই হাসে এই কপাল চাপড়ায় ।

মানিক জ্বলে মানিক নেভে
সমস্ত রাত
বুকের মধ্যে শঙ্খচূড়ের যাওয়া আসা
এই নাচে এই দারুণ গর্জায় !

৪০

চোখের জলের সাগর
হিম সাগর
কেন বিষের লবণে জ্বলিস
তৃষ্ণা ঢেকে !

বুকের মধ্যে থেকে থেকে
সাপের ছোবল,
ঢেউগুলি আছড়ায় ;
কোথায় যেন নরখাদক ক্ষুধায় আকাশ ছেঁড়ে !

অনেক দূরে মাটির দেশ, স্বপ্নের চাষিরা
সেখানে বীজ বোনে,
ভালোবাসার শিশুরা গান গায়...
অনেক দূরে !

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলিকে
মদ, জুয়া, আড্ডা আর খেয়ালখুশিতে
উড়িয়ে, ছড়িয়ে তবু শিল্পীর অমর
সাধনায় ইচ্ছে ছিলো তারও ভাগ নিতে
একনিষ্ঠ আত্মদানে। তাই রাজনীতি
পেশা নয়, কিংবা মাতালের উচ্ছৃঙ্খল
চিৎকার ছিলো না তার ; বরং মানুষ
সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে তার চোখে উজ্জ্বল

হয়েছিলো। সবচেয়ে বেশি ছিলো মনে
মানবতা ; তাই তাকে খিদিরপুরের
ঘোড়ারা ছোটাতো কিন্তু পারতো না মন্ত্রীরা
কোনো লোভ দেখিয়েই চোর বানাতে। ঢের

পুরস্কৃত হওয়া যেতো, এমন সুযোগ
উপোসেও নেয় নি সে ; সয়েছে দুর্যোগ ॥

সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের গান

পাহাড় পাহাড় পাহাড় রে
পাথর সমুদ্দুর,
রাত ফুরুলেই বাহার রে
মুখভরা রোদ্দুর।

পাহাড় পাহাড় পাহাড় রে
পাশাবতীর ঘর,
রাত ফুরুলেই বাহার রে
বুকভরা ঈশ্বর ॥

অমল উৎসব

মাঘ পঞ্চমীর শীতে
হাসে মহাশ্বেতা
ক্রমে অন্ধকার ভোর হয়।

বুঝি অনাহার দুর্ভিক্ষ প্রলয়
অবসিত হবে
অমল উৎসবে।

হরিৎ বৃক্ষের সভা

চাঁদের আলোয় গাছেদের সভা, বসন্তের উদাস হাওয়ায়
মন কোথা চ'লে যায় ব'লে
মনকে আগলায় সভা ক'রে। পরস্পর মনের অসুখ
নিয়ে পরিহাস করে কৃষ্ণচূড়া অশ্বত্থ তমাল, ওরা
সম্বিত হারাতে রাজি নয়।

হরিৎ বৃক্ষের সভা সারারাত কথা বলে, জয় করে অশরীরী ভয়॥

রাজা

কাজ আছে তার, রাজার অভিনয়ে
শোভা আনতে, রাত্রি জাগতে, কাজ;
সাজ রয়েছে কোথায় ধুলোয় প'ড়ে
হায় রে, তার বাহবা বুঝি জোটে না আর! আজ
ঘুমুতে না পারার কাজ রয়েছে; যায় নিশীথ যামিনীর
প্রহর থেকে প্রহর সর্বনাশা কাজের পাহারায়॥

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

সেই দেশে স্বর্গ ও নরক
সারারাত সাপের মাথার মণি নিয়ে
খেলা করে। তারা মদ না খেয়েই
পাঁড় মাতাল হয়, পুরুত ছাড়াই বিয়েতে বসতে চায়।

রাত প্রভাত হলে শুধু সাপের খোলসগুলি
প'ড়ে থাকে ॥

চলচ্চিত্র

জন্ম থেকে বধির যে-জন
আঁতুড় থেকে বোবা
কেউ শ্রোতা, কেউ সভায় ভাষণ দেয় ;
আগে পাছে মিছিল হাঁটে, কেউ খোঁড়া কেউ কানা
ঝাণ্ডা হাতে কুঁজো দেখায় পথ।

জন্মভূমি মুখ ঢেকেছে ঢাকুক ;
ঘৃণা লজ্জা ভয়
এ তিন থাকতে নয়
জেনে ঊর্ধ্বে মালা তুলছে কোমর ভাঙা ঢোঁড়া
সেই আগলায় পথ।

পথের শেষে লুটিয়ে আছে রক্তমাখা
ধর্ষিতা এক নারী।

বাজারের সেরা

খড়ের পুতুলগুলি নিওন আলোয়
প্রত্যেকেই উজ্জ্বল বাহবা ;

বাজারের মধ্যখানে তাদের দুর্জয়
স্পর্ধা যেন রাজসূয় সভা

যা দেখে ঈর্ষায় কাঁপতো কুরুপুত্রগণ ;
কিন্তু এখন দর্শকেরা
এক টাকায় কিনে নেয় কয়েক ডজন
এবং যা বাজারের সেরা ॥

আঁধারে যায়

আঁধারে যায় সীতার চোখের জল
রাত ফুরোয় না । ঝরা পাতার মতো শীর্ণ
বসুমতীর চুমাগুলি কাঁপতে থাকে
শূন্যে । আঁধারে যায় বুকের ক্ষতচিহ্ন ;
আমার রাজেশ্বরীর চিতা
জ্বলছে রামায়ণের পালা মাতৃহীন শিশুর কণ্ঠে ।

রাত্রি, কালরাত্রি

ভুবন ভ'রে গিয়েছে আজ
চোখের জলের সমারোহে ;
যেদিকে চাই ক্ষুধার সভা
নরক যেন যায় বিবাহে ।

অথচ দশ দিক বিধবা
বোবার মতো দাঁড়িয়ে দূরে ;
বধির যারা দেয় বাহবা
একটি দুটি পয়সা ছুঁড়ে ।

বিবসনা বসুন্ধরা
সপ্তঋষির অঙ্গ জুড়ায় ;
গন্ধে বাতাস শিউরে ওঠে
আলোর দেশে ঝড় বয়ে যায় ।

অনেক দূরে অরুন্ধতীর
ওষ্ঠ জ্বলে চোরের চুমায়
আর সমস্ত আকাশ জুড়ে
যুধিষ্ঠিরের কুকুর ঘুমায় ।।

পুনর্জন্মের প্রার্থনা

কোজাগরী পূর্ণিমার অমা
শান্তিজলে ধুয়ে দাও, রমা !
এসো লক্ষ্মী, অন্ধকার ঘরে
মহাশ্বেতা ভগ্নী কাঁপে জ্বরে
তুষারের মুখের উপমা ।

উপবাসী বাংলার সম্বল
শারদার নয়নের জল
ভাগীরথী পদ্মার উজান !
কান্নাধোয়া আমাদের গান
স্ফটিকের কঠিন নির্মল !

পুঞ্জীভূত অশ্রুর প্রতিমা
সরস্বতী যাচে আজ ক্ষমা
নিষ্করুণ বুভুক্ষার কাছে ;
তামার পয়সা পেলে নাচে
দেয় মৃত অস্থির সুষমা ।

কিন্তু যদি তুমি প্রীতি কর
ভগ্নীর মুখশ্রী বুকে ধর—
শুষ্ক তরু হবে মঞ্জরিত ;
নবজন্মে বাংলার অমৃত
মাটি পাবে শান্তির কোমল ।।

আলোর মুখশ্রী তুমি

আলোর মুখশ্রী তুমি নির্মল আনন্দ
পঙ্কে যেন নীলোৎপল হেসেছ দুর্যোগে ;
রক্তস্নাত হৃদয়ের দুরারোগ্য রোগে
যে তুমি শান্তির স্পর্শ, চন্দনের গন্ধ ।
কে তুমি দেখি নি মুখ তবু চেতনায়
এলে যেন নবজন্ম ক্রান্তির আশ্চর্য ;
চারদিকে গায়ত্রী ভোর, জ্যোতির্ময় সূর্য
শবযাত্রাব অন্ধকার দিগন্তে ভাসায় ।

অথবা বেহুলা তুমি, কোলে লখিন্দর
কবে ছিল মৃতদেহ, অস্পষ্ট এখন ;
হয়তো যুগল পুনর্জন্মের নির্জন
স্বপ্ন তুমি, সূর্য তাই মুখের উপর !
কিংবা তুমি সায়াহ্নের নতজানু যীশু ;
তোমার যন্ত্রণা নিয়ে তাই আমি শিশু ।।

রাত্রি কালরাত্রি : ২

শুকনো কুসুমের অসীম শূন্যতা
অবাক্ চুমুগুলি জানে না ভোর ;
ক্রমেই রাত বাড়ে, কেবল রাত বাড়ে
ঘুমের চোখ জ্বলে বুকের হাহাকারে
ক্লান্ত স্বপ্নেরা তাড়ায় নীলিমাকে
প্রেমের গান কাঁপে . 'কী হ'ল তোর ?'

শরীরে হাত দিতে সাপের শীতলতা
ধবলগিরি যেন অগ্নিময় ;
ক্রমেই শীত বাড়ে, কেবল শীত বাড়ে
যেভাবে মিছিলেরা দাঁড়ায় অনাহারে
আহত বাঘ যেন, সামনে রাইফেল
শিথিল করে মুঠি দারুণ ভয় !

কেন যে একদিন গোলাপ কিনেছিলি
বুকের মণিহার খোঁপায় জ্বালাতে ;
ক্রমেই রাত বাড়ে, কেবল রাত বাড়ে
স্মৃতির চুমুগুলি শুকায় অনাদরে
যে আশা দিয়েছিলি এখন পুড়ে যায়
তোর ললাটে, ঠোঁটে, শুকনো মালাতে ।

রাত্রি শিবরাত্রি

ভুবন ভ'রে দিয়েছে আজ
রাঙা কুসুম সমারোহ ;
শিবের কোলে পার্বতী যায়
সারাটি রাত তার বিবাহ ।

অনাদরের জটায় জ্বলে
সাপের মাথার মানিক জবা,
পাহাড়ে যায় কন্যারা আজ
বুকের মধ্যে সব সধবা ।

সাগরে যায় কন্যারা আজ
বেহুলা যেন বসন খোলে ।
সাপখেলানো আলোর নাচে
মহাদেবের আসন দোলে ।

স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যায়
কন্যারা আজ জাগরণে
বিভাবরীর চন্দনে যায় ;
তারই আলোক তিন ভুবনে ।

মদনভস্মের পর

কুশল, তোমার কুশল পার্বতী !

স্বচ্ছ সরোবরে দেখ বয়েস ভাসে রক্তকমল
তুমি বুকের চন্দনের শোভা চোখের জলে ধুয়ে এসেছ,
বলো তোমার প্রার্থনা কী আছে কন্যা যার জন্য পদ্মকোরক শুকিয়ে যায় ?

তুমি শ্মশানভস্ম মাখবে ব'লে কোমল স্তন কঠিন করো
সন্ন্যাসিনী ;
কুশল, তোমার কুশল ।

তোমার পতাকা যারে দাও : নতজানু বেশ্যার প্রার্থনা

করুণাময় ! তোমার হেঁয়ালি
দিয়েছ নির্দেশ, ভালবেসে ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে,
এবং আমার ভাল থাকার শিবরাত্রি !

হয় কী প্রভু !
ভোর না হ'তেই সমস্ত দেশ 'ফ্যান দাও' চিৎকার !
মায়ের পেটে শিশু জন্মায়, একই সঙ্গে পশু আর ভিক্ষুক ;
কী ক'রে আমি দুর্ভিক্ষের দেশে আমার এ-কুল ও-কুল দু-কুল রেখে প্রেম
বাঁচাবো ?

চতুর্দিকে অন্নহীনের নিষ্ঠুরতা ; যেদিকে চাই, যতদূরে যাই, নেকড়ের
চেয়েও ভীষণ মানুষ
ঘোলাটে চোখে তাকায় : 'দাও আমাকে, দাও আমাকে...' যেন
দাউ দাউ জ্বলছে ক্ষুধায় আগুন !
আমি ঘুমের মধ্যে দারুণ ভয়ে শিউরে উঠি : আমার শিবরাত্রির
সমস্ত রাত মাথার বালিশ, মুখের গ্রাস কাড়ে !

হয় কী প্রভু ! উপোসে আমার জন্ম, জীবন কেটেছে আঁস্তাকুঁড়ের চারপাশে ;
বুকে স্তনের কুঁড়ি না ফুটতে দেখেছি স্বর্গ আর নরকের বিয়ে ! আমি সারাজীবন
হাজার বলির পশুকে বুকে মুখ রাখতে দিয়েছি, তবু পারি নি ঘুম পাড়াতে ;
কী ক'রে জ্বরে ক্ষুধায় ভয়ে কাঁপতে থাকা শিশুকে আমি ঘুম পাড়াবো ?
প্রভু, আমি যে উপবাসের নিয়ম মানি ।

করুণাময় ! তোমার হেঁয়ালি
ফিরিয়ে নাও ! আমি সারা জীবন অক্ষমতা নিয়েছি মাথা পেতে
নিজের ধিক্কারে ; আমি সারা জীবন পাতাঝরা গাছের মতো ।

হায় রে, তুমি এখনো বলো চিরহরিৎ বৃক্ষ হতে ! তুমি এমন দিনে
ক্ষুধার্ত নেকড়ের চেয়েও নিষ্ঠুরতা ছুঁড়ে দিয়েছ ।
(ব্রেখ্‌ট্‌-অনুসরণে)

নাচো রে রঙ্গিলা

নাচো হার্লেমের কন্যা, নরকের উর্বশী আমার
বিস্ফারিত স্তনচূড়া, নগ্ন উরু, স্খলিতবসনা
মাতলামোর সভা আনো চারদিকের নিরানন্দ হতাশায়, হীন অপমানে
নাচো ঘৃণ্য নিগ্রো নাম মুছে দিতে মাতালের জাত নেই,
পৃথিবীর সব বেশ্যা সমান রূপসী !

নাচো রে রঙ্গিলা, রক্তে এক করো স্বর্গ ও হার্লেম ।

বাংলা দেশের হৃদয় থেকে . ১

সমস্ত রাত বুকফাটা চিৎকার
সমস্ত রাত মাইকে হিন্দী রেকর্ড ;
সমস্ত রাত রাংতায় মোড়া খড়গ
নিজেকে ব্যঙ্গ করে ।

রানি, আমার রানি

ভালবাসার দিনগুলিকে
ফিরিয়ে দেবে কোন নবান্ন ,
অন্ন কি শ্মশানের মানিক
জ্যোছনা আনবে শুকনো কাঠে !

'রানি আমার রানি' ব'লে
কণ্ঠ চিরে যতই ডাকো ;
কেউ দেবে না সাড়া, সবাই
হৃৎপিণ্ড ছুঁড়ে দিয়েছে।

জল দাও

দিঘিভর্তি জল, সত্যিকারের জল
গাছের পাতায় সত্যিকারের হাওয়া ,
তুমি মন্ত্র জানো !

কত দিন যে জল দেখি নি, রোদ দেখি নি—
মাথার ওপর সত্যিকারের সূর্য ওঠা !

কত দিন যে বুকের মধ্যে বাতাস মানে শুধুই বিষ,
কত দিন যে নরকবাস হ'লো! তুমি সত্যি ক'রে বলো,
বাংলা দেশের পুকুর আবার জলে ভরবে
রোদে হাসবে আকাশ ?

নাকি ম্যাজিক, শুধুই ম্যাজিক, শুধুই চোখের জল !

কয়েকজন ভিক্ষুক

দিঘির জল আগুন
কুয়োর জল ছাই ;
জননী বলেছিলেন
পিপাসা পেতে নাই ।

আকাশে হাত বাড়ালে
হাসে সবাই আড়ালে ;
দুয়ারে হাত বাড়ালে
সবাই দেয় খিল ।

রোদ না উঠতে, ফ্যান দাও !
রোদ চলে গেল, ফ্যান দাও !
ঘুমের মধ্যে ভয়ে
পা দুটি সরিয়ে রাখি ।

সত্যকাম

চারদিকের নরকে যেন ধর্ম তোর
জেগে থাকে অনাথা জননীর স্পর্ধা
ধর্ম তোর, আগুনে পুড়ে, আগুনে হাত রেখে
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ।

পৌষ

সারা দুপুর পাখিগুলি
রোদ পোহায় ;
সমস্ত রাত পাখিগুলি
শীত তাড়ায় ।

কে মুখোশ, কে মুখ, এখন

কে মুখোশ, কে মুখ এখন
স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। কঠিন অসুখ
সেরে গেলে যে রকম অসহায় ;

মাথার ভিতর শুধু স্মৃতি ঘোরে ; শিয়রে, পায়ের কাছে
ইচ্ছেগুলি সাপের চুমার মতো অন্ধকার ; আর ঘুমের
ভিতর স্বপ্নগুলি
পারে না নিঃশ্বাস নিতে।

মাতলামো

গাছে ফুলের কুঁড়ি না ধরতেই
তুষারপাত শুরু হয় ;
পাখিগুলির চোখ ফুটবার আগেই
শীত এসে যায়।

একটি স্বাধীন দেশের বুক থেকে
যখন উলঙ্গের আর্তনাদ
আর নিরন্নের চিৎকারই শুধু
উচ্চারিত হতে থাকে,
তখন আমাকে যত মদই গেলানো হোক না কেন
কেউ বলতে পারবে না
আমি কোন স্বর্গকে নরক বানাচ্ছি ॥

ক্রুশবিদ্ধ মানুষের ছবি

ঘরে ঢুকতেই দেয়াল জুড়ে সেই মানুষের ললাট
নিয়ন আলোয় কেমন যেন স্থির জ্বলছে, স্থির !

কেমন যেন রক্তমাখা আলোর ফুল, আলোর ফুল···
ঘরের বাইরে অঝোর বৃষ্টি ঝরে।

ঘরের বাইরে অঝোর বৃষ্টি, বৃষ্টি আর অন্ধকার
অন্ধকারে আলোর ফুল সূর্য গেছে ডুবে!
কেমন যেন ঘরের মধ্যে নিয়ন আলোর দ্বিপ্রহর,
রক্তহীন মৃত মানুষ, দেয়াল জুড়ে জ্বলছে ললাট লিপি।

আলোর ফুল, আলোর ফুল...কোথায় আমার ভালবাসার
স্বপ্নগুলি ?...বৃষ্টিতে যায় সকল রক্ত ধুয়ে!
অন্ধকারে সূর্য ডোবে, ঘরের আলো কাঁপায় অন্ধকার;
বুকের মধ্যে অবাক জেরুজালেম, স্থির!

বুকের মধ্যে অবাক মরুভূমির তীর্থ; বাইরে বৃষ্টি,
বাইরে অঝোর বারিধারা!
আমার ঘরভরতি শুধু ক্রুশের চিহ্ন, করুণাহীন;
কোথায় আমার রক্তমাখা আলোর ফুল, ক্ষমা?

সে

হাত বাড়ালেই পাবি নে তাকে;
সে আছে তোর বুকের মধ্যে
হৃৎপিণ্ডের পিদিম।

মুখে ভোরের রোদ পড়েছে

মুখে ভোরের রোদ পড়েছে,
কিন্তু তোর বুকের ভেতর
যায় না দেখা।

সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখব,
তোর বুকের ভেতর।

অন্ধ পৃথিবী

কার পাপ আমাদের রক্তের ভিতরে ;
কার অন্ধকার ?

কণ্ঠস্বর.

ভেসে আসে, 'জোর যার'...
মানুষ কি এখনো তোমার
চোখ-রাঙানো প্রেমের চাকর ?

অথচ কোথায় যাব ? এ পৃথিবী আমার, তোমারো
'মারো ! যত পারো !'

কী আছে আমার দিতে পারি

কী আছে আমার দিতে পারি
যা তোমার অন্ধকারে আলো
যা তোমার আলোয় উৎসব ?

আমার দৃষ্টিতে নেই সে স্বচ্ছতা
যাতে তোমার মুখশ্রী ছায়া ফেলে
আর তরঙ্গিত হয় একটিই অমল সংগীত।
আমার বাহুতে নেই সেই বরাভয়
যেখানে তোমার শান্ত ঘরবাঁধাব স্বপ্নগুলি
স্থির হয় ভুবনমোহিনী কবিতায়।

কী আছে আমার দিতে পারি
যা তোমার প্রতীক্ষাকে মন্ত্র করে
তোমার ক্ষমাকে করে বিভাবরী রাত্রির চন্দন ?

আমার রয়েছে শুধু হৃৎপিণ্ডের একটি রক্তজবা ;
রক্তমাখা নদীর প্রার্থনা ।
যদি বলো, এ মুহূর্তে ছিঁড়ে দেব ;
তুমি বাসি ফুল, অপবিত্র জল, ভোরবেলায়
ছুঁড়ে ফেলে দিও ।

আশ্বিন

রোদ কোথায় ? কোন রমণীর
পিঙ্গল নয়নে ; কোন পুরুষের
কেশরে ? সবাই ভোরবেলা
ঘুম চায় প্রাচীন নিয়মে ;

আর বৃষ্টি ; অবিশ্রাম বর্ষার
প্লাবনে শূন্য মন্দিরের
অন্ধকার !

অমলের জন্য

কখন মানুষ ভালো, কখন খারাপ
বলা বড় কঠিন, অমল ।
সময়ে খুনীও দেবতার মতো হয়ে যায়
তৃষ্ণার শিশুকে দেয় জল ।
সময়ে বেশ্যার বুক মন্দিরের মতো শুভ্র ;
স্বচ্ছ নামে নদীর কল্লোল !

রাত্রি, ক্ষমাহীন

১

হলুদ পাতার গান, ঘরে ফেরা পাখি
তৃষ্ণার নদীর কণ্ঠস্বর ;
সকলই নির্জন !

রাত্রি আজ গভীর একাকী ।

২

মনে হয়
নীলকণ্ঠ বৃক্ষের হৃদয়
তমসায়
দ্বার হতে দ্বারে ভিক্ষা চায়
শীতের অনল ;

রাত্রি ক্ষমাহীন কোলাহল !

রক্তাক্ত দক্ষিণা

কঠিন সবিতাব্রত ; তাই রাত জেগে
কবিতা লিখি না ।
অথচ সূর্যের স্তব ছাড়া কবিতার
আজ কোন অর্থ আছে কিনা ।

ভোরের বৃক্ষের কাছে, সন্ধ্যার নদীকে
প্রশ্ন করি···নিরুত্তর···একমাত্র দ্বিপ্রহর দাবি করে রক্তাক্ত দক্ষিণা ।

বুকের ভিতর

বাইরে যদিও গভীর অন্ধকার
বুকের ভিতর বৃষ্টির ঝরঝরানি ;
যেন পিপাসায় শিশুরা হাত বাড়ায়,
কান্নায় ধোয়া পৃথিবীর রাত ভোর হয়ে গেল ভেবে।

ভালবাসলে হাততালি দেয়

ভালবাসলে হাততালি দেয় এমনি ওরা গাধা
বলে, তোমার বুকের ভিতর ম্যাজিক দেখাও, ম্যাজিক—
দেব আমরা হাজার টাকা চাঁদা।

যদিও ভালবেসে আমাব মাথার চুল সাদা।

শীত

"বুডি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে"
—জীবনানন্দ দাশ

১

করুণাহীন অন্ধকারে
একাকী জাগে শীতের বাঘ ;

সমস্ত রাত হলুদ পাতা ঝরে।

২

মেঘনাচানো কান্নাগুলি
তিন পাহাড়ের চূড়ায় ;
তুষারে ঢাকা মহুয়া বন
থরথরিয়ে কাঁপে।

৩

বুড়ি চাঁদ গেল ভেসে
কোথায়, কে জানে ?

কিছুই যায় না দেখা কুয়াশায় ।

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং বঙ্গসংস্কৃতির বন্ধুদের মনে রেখে

এমন এক অন্ধকার সময় আসে
যখন সৎ থাকার অর্থ রাস্তায় দাঁড়ানো
যখন বিশ্বাস মানেই পায়ের নিচে মাটি নেই ।

যে কবি হতে চেয়েছিল
তাকে দেখলাম মর্গে শুয়ে আছে
যে ভালবাসতে চেয়েছিল
এখন তার গভীর ঘুম ।

এমন এক অন্ধকার সময় আসে
যখন বন্ধুর দিকে দু'হাত বাড়ানোই
আত্মহত্যা ।

ভিক্ষার মিছিল যায়

আসমান ছেয়ে গেছে
পতাকায়, ফেস্টুনে, গর্জনে ;
মনে হয় দৃশ্যের দর্পণে
বুঝি দ্রুত পৃথিবী বদলায় ।

কুয়াশায়
ও শুধু চোখের ভুল, যা দেখিস,
ভিক্ষার মিছিল যায়।

হাজার বাঘিনী ডাকে

যে উন্মাদ, মিলবার মাতলামোয়
সূর্যাস্তের রক্তে আবীর মাখা
হাজার বাঘিনী ডাকে ;

আগুনের ফুলগুলি জ্বলে ওঠে সন্ধ্যায়
ছিঁড়ে দিতে হৃৎপিণ্ড।

আশ্বিনের মুখোশ

উৎসবের পোশাক চতুর্দিকে, আলোর মুখোশ
ঠিকরে পড়া চোখের মণি নাচায় অবাক হাট।
হাট পেরুলেই ধুধু করছে তেপান্তরের মাঠ…
ঘরে ফেরার অসীম অন্ধকার।

যেন কেউ মন্ত্রী হয়ে

যেন কেউ মন্ত্রী হয়ে এইসব মানুষের প্রেম, মানবতা
কিনে নেয়, যেন দুর্ভিক্ষের বাংলা মন্ত্রীদের সোনার থালায়
পায়েস খাওয়াবে ব'লে এই সব খবরের কাগজের বার্তাবহদের
জলসাঘরে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

এরা ভুলে যায়
দু'দিন আগেও অন্য প্রভুদের বাহবায় কীভাবে কেটেছে ভোর থেকে সন্ধ্যা।

ভুলে যায় বিশ বছর জন্মভূমির দিকে পিঠ রেখে অন্ধকার রাত্রির আড়ালে
গুপ্তচর, খুনী, গুন্ডাদের সঙ্গে খানাপিনা, যখন তখন ককটেল পার্টি ;
অতি-ভোজনের শেষে কীভাবে সামলাতে হ'তো ছিঁড়ে যাওয়া প্যান্টের বোতাম !

এরা খবরের কাগজের সাংবাদিক :
ভুলে যায়, নিরন্নের বাংলাদেশ মন্ত্রীর মুখের শোভা নয়, অন্ন চায়···
ভুলে যায়, বাংলার মানুষ আজ আগুনের পথ হাঁটছে।

জন্মভূমি আজ

একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।

এখনো রাত শেষ হয় নি ;
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিশ্বাস নিতে পারছো না।
মাথার ওপর একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে।
তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও
তুমি ভয় পাও নি।

মাটিতো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।
যে মানুষ গান গাইতে জানে না
যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়।
তুমি মাটির দিকে তাকাও, সে প্রতীক্ষা করছে ;
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।

সুভাষ যা দেখেছেন

('ক্ষমা ? ক্ষমা নেই'—সুভাষ মুখোপাধ্যায় : আনন্দবাজার পত্রিকা, বুধবার ৬ পৌষ ১৩৭৮)

সুভাষ ! যা দেখেছেন যশোহরে, মণিরামপুরে ; যে পিশাচ
জল্লাদ মেহের আলি—তার কীর্তি, পাশবিক ধর্ষণ ও নরহত্যা :

চোখে কি পড়ে নি, অন্য এক অবাক বাংলায়, যা আপনার স্বদেশ, সেখানে
ঐ কালো ছায়া—ঐ ভয়ংকর মুখ। মানুষের মাংসপিণ্ডলোলুপ নরখাদক
আমাদের আকরমের মেয়েদের ভাতের থালায় লাথি মেরে
নিয়ে যায় আকরমকে থানায় ; বেয়নেটে খুঁচানো ইসমাইল পড়ে থাকে
নির্জন খালের ধারে—

'ক্ষমা ? ক্ষমা নেই'—আপনার পবিত্র স্পর্ধা মানুষের সপক্ষে, সুভাষ ;
এই তো প্রত্যাশা ছিল। আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলি প্রতিবেশী পশুদের
পাপ কিংবা পুণ্যশ্লোক কবিদের দেশপ্রেম ছাড়া
সংবাদ ছাপে না··

আপনার প্রচণ্ড ক্রোধ—দেশান্তরে—তাই আমাদের কেমন তরল ব'লে
মনে হয় !

১৯৭১

নরক

যত হত্যা তত জয় ; যত বেশ্যালয়ে বেলেল্লার অশ্লীল দূষিত রক্তে মুহুর্মুহু
করতালি, তত উলুধ্বনি ঘরে ও বাহিরে ; নাচে নগরীর শ্রেষ্ঠ
পুরোহিতগণ, নাচে মন্ত্রী, নাচে বিরোধীদলের নেতা ; নিষ্পাপ গর্ভের
শিশু রক্তে ভাসে, নাকি বেশ্যাদের গর্ভে জন্ম নেই, নবজন্ম শুধু আমাদের
মস্তিষ্কের জ্বর ; আছে সর্বত্র নরক ; বেশ্যালয় এখন মহৎ নাগরিকদের
জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সভা ; সভা ঘিরে ভিতরে বাহিরে, যত ইস্তেহার মিছিল
ভাষণ, তত ভাড়াটে পুলিশ, খুনে দীর্ঘ হয় ; স্ফীত হয় তাদের উদর, হস্ত,
নাসিকা, জিহ্বার অগ্রভাগ নরখাদকের আস্ফালনে, ইতর, অশ্লীল···

কেন না হত্যাই সত্য, হত্যা ধর্ম। কে মারে এবং কাকে মারে, এই নষ্ট-চরিত্রের ভিড়ে কেউ নেই হিসেব নেবার। শুধু হত্যা চাই। শতে শতে হাজারে হাজারে বালক বালিকা শিশু পরস্পরের মৃতদেহ মাড়িয়ে, এ-ওর রক্তে হাতের নিশান লাল থেকে আরো গভীর, নিষিদ্ধ লাল করার উল্লাসে আত্মহত্যা আর হত্যার পার্থক্য রক্তে ধুয়ে নিয়ে অগ্রসর ; ক্রমে অগ্রসর বুড়ো পাপীদের মজার যৌন হাতছানিতে, নির্দোষ প্রেমের শিশু, অনভিজ্ঞ, হত্যাকেই প্রেম ভেবে আরো অগ্রসর বীভৎস অপ্রেমে ;

যখন তাদের পিতার নাম ভুলিয়ে দেবার জলসাঘরে একডজন বেশ্যা কোলেপিঠে নিয়ে ঈশ্বর এবং শয়তান একসঙ্গে মদ আর মাংস চাটে, শিশুর রক্ত ও হাড় !

একটি কান্নার অনুভব

ভোর বেলার ফুল
ভোর বেলার
বৃষ্টিভেজা আলোর ফুল

আলোর অমল

সারা গায়ে মাটির স্পর্শ
জলের স্পর্শ
ভোর বেলার ; আহা রে, সেই
অবাক ভোরবেলা !

সারারাত প্রার্থনা

সারারাত গান
ভেসে আসে জ্যোৎস্নায় ;

সারা রাত প্রার্থনা !

সারা রাত কাঁপে
নিশি-পাওয়া চন্দন ;

সারা রাত উপবাস ।

আধখানা

আধখানা মুখ আয়নাতে
আধখানা মুখ তোর হাতে ;
আধখানা মুখ রোদ ভাসায়
আধখানা তার কান্নাতে ।

ব্রত ভাসাও

ব্রত ভাসাও জলে, কন্যা
ব্রত ভাসাও জলে ;
তোমার মুখ আগুন, কন্যা
পাড়ার লোক বলে ।

স্থির চিত্র

গোধূলি যেন নীললোহিত,
জটায় কাঁপে মাঘের শীত ।
রাত্রি যেন তার শিবানী
তুষারে গায় ঘুমপাড়ানী ।

আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা

আমি কি তোর চোখের কালো
আলো করার মন্ত্র জানি ?
আমি শুধুই অবাক রাতে
তোকে রাণীর মতো জেনেছি ।

আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা
কেড়েছে তোর অন্ধকার পায়ের কাছে
উলঙ্গ ভিক্ষুক!

রাত ভোর হয়ে আসে

আমার সোনার বাংলা, আমার কবিতাকে

১

আধখানা আলো আধখানা কুয়াশায়
কাঁপে তোর শর্বরী ;

যেই তোকে বুকে ধরি
অমনি নীলিমা ম্লান হয়ে আসে, ক্রমে
চন্দন তোর রক্ত বমন করে…

২

কী তোর গভীর বিষাদ ;
দু'পায়ে মাড়াস স্বপ্ন, আমার কবিতা ?
তোকে দিতে চাই হাতের মুঠোয় যতগুলি ফুল ধরে…?

সমস্ত রাত পুতুল ভাঙার শব্দ !

রক্তকরবী! তোকে

রক্তকরবী ! তোকে
কোথায় দেখেছি দারুণ শোকের সন্ধ্যায়,
কিছুই পড়ে না মনে ।
বুকের মধ্যে যত খুঁজি, তত যন্ত্রণা বেড়ে যায় ।

এখন গভীর রাত্রি ;
আমার স্বদেশ পায়ে পায়ে কোন তিমিরের অভিসারে
চলেছে সঙ্গোপনে !
'কোথা যাও তুমি ?' কেউ নেই তাকে প্রশ্ন
করতে পারে ।

কেউ নেই এই ঘোর অমানিশায়
ফুলগুলি তুলে রাখে—
শপথের মত টকটকে লাল ফুল
ঝরে যায় যেন রক্ত বমন করে !

বুকের মধ্যে ভালবাসা বুক ঢাকে ।

বেহুলার ভেলা

গাঙুরের জলে ভাসে বেহুলার ভেলা

দেখি তাই, শূন্য বুকে সারারাত জেগে থাকি—
আমার স্বদেশ করে কাগজের নৌকা নিয়ে খেলা ।

শিশুগুলি কেঁদে উঠলো

শিশুগুলি কেঁদে উঠলো এ-ওকে জড়িয়ে
ঘুণধরা অন্ধকার ঘরে ;
তাদের পিতারা কবে গেছে জাহান্নমে
যে-যার বেশ্যাকে খুন ক'রে···

দেয়ালের লেখা

তোমার অস্তিত্ব সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেবো হে তাপস বৃক্ষ,
আমার বিবাদ আজ পৃথিবীর যাবতীয় ওষধির সাথে ঃ
পৃথিবীর সমুদয় চিত্রশালা, সংগীত, বিজ্ঞান
ভেঙেচুরে আমি আজ বানাবো ঈশ্বর এক অভিনব, সে
আমাকে শেখাবে অপ্রেম ।

সে আমাকে শেখাবে কবিতা, স্পর্ধিত কুঠার আর বারুদের
গন্ধমাখা আগ্নেয় উল্লাস :
আমি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় একশত কিশোরের কিশোরীর
ছিন্নমুণ্ড নিয়ে
দেবো তাকে প্রণামী, আমার আত্মার ক্ষত থেকে যে দূষিত রক্ত
বিস্ফারিত, আমার হিংসা ও ঘৃণা।

বিশল্যকরণী, নাকি বটবৃক্ষ, ছায়া দাও
কিন্তু কাকে ? আমার ঈশ্বর চায় জ্বলন্ত আগুন ঃ
সে আগুনে পুড়ে যাবে পৃথিবীর কোঠাবাড়ি, জাদুঘর,
বিঠোফেন, মাতিস ও কার্ল মার্কস্
এবং এ নষ্ট শতাব্দীর শিশুসদন যেখানে শুধু জন্ম নেয়
অর্ধনর-অর্ধপশু ক্রীতদাস, বিচিত্রবীর্যের পাপ।

সব আছে মার্কাস স্কোয়ারে
কোকোকোলা, নেস্লস্-এর কফি
সিনেমা, সংগীত, অভিনয়
অধ্যাপকদের গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা, নতুন-রীতির স্পর্ধা
সাংবাদিকের দম্ভ, কবির বাহবা
আছে রূপসীর চোখে কটাক্ষ, মাতালের মাতলামো
শ্রোতার হাততালি, দর্শকের ঠেলাঠেলি···

নেই শুধু মদন বাঁড়ুজ্যে ; নেই কবি-গান
মালদহের গম্ভীরা, রায়বেঁশে নাচ ; নেই ভাটিয়াল-বাউলের
কণ্ঠস্বর
নেই বাঁকুড়ার কৃষ্ণনগরের পুতুল, লক্ষ্মীর সরা

নেই বাংলা দেশ।

নিরাপদ মাননীয় মানব সমাজ

'I smell dark police in the trees.'

দীর্ঘ দেবদারু বীথি আজ কোনো আকাশ দেখে না
এখন আকাশ জুড়ে নষ্ট চাঁদ, শুরু হবে পিশাচের নাচ ;
এখন বাতাস দগ্ধ দুধকলা দিয়ে পোষা সাপের নিঃশ্বাসে··
ভাল আছে—নিরাপদ—আমাদের মাননীয় মানব সমাজ ॥

মাতলামো

'I do not provoke, I am drunk.'

উত্তেজনা ছড়াই না। কেন না এ মৃতবৎসা দেশে
আগুনের ফুলকিগুলি শ্মশানের বাহবা বাড়ায়।
দূর থেকে শোনা যায় শৃগালের হাসি আর হায়নার গর্জন ;
যত রাত দীর্ঘ হয় ততই বাঘের চোখ ভৌতিক আলোর মত,
পাড়ায় পাড়ায়
ছড়ায় আতংক ! ক্রমে উলঙ্গের দীর্ঘশ্বাস, 'হা ভাত, হা ভাত' শব্দ
ক্ষীণ হ'য়ে বাতাসে মিলায়···
উত্তেজনা ছড়াই না। বরং এ শ্মশানের শান্তি থেকে পরিত্রাণ কী আছে,
কোথায়,
খুঁজি উন্মাদের মত ; ভয়ংকর দৃশ্যগুলি দু'হাতে সরাতে চাই,
কিন্তু আমার দুই হাত ভর্তি ভিক্ষার বিস্বাদ অন্ন—
আমি কাকে পথ দেখাবো ? কোন পথ ? 'স্বাধীনতা, হায় স্বাধীনতা—'
বুকে যত তোলপাড় রক্ত, ততই ভিতরে রক্ত জল হ'য়ে যায় ;
মৃত্যুর ধোঁয়ার ঝাপসা চোখে সব অন্ধকার ! শুধু স্বর্গ মনে হয়
গেলাস গেলাস মদ, মানুষ নামের জন্তু যেখানে স্বাধীন, গায়
মাতলাম'র গান
'কে কার তোয়াক্কা রাখে'...আমি সেই মাতালের কোমর জড়িয়ে হৈ-হৈ
জীবনের স্বপ্ন দেখি, হয়তো কিছু বেসামাল কথা বলি : 'এ নরকে
ঈশ্বরের বাচ্চা আর নেড়ীকুত্তা সমান সমান—
কে কাকে রাঙায় চোখ !'

উত্তেজনা ছড়াই না। শুধু, মাথার ভিতরে মদ গাঢ় হ'লে,
যে কোন উলঙ্গ মানুষের কাঁধে মাথা রেখে, গভীর ঘুমাতে চাই ;
ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখি, বাঘ-শিকারের স্বপ্ন, তখন আমার হাতে
অব্যর্থ নিশানা।
আবার কখনো ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে চিৎকার করি : 'এই সংবিধান ঝুটা।

স্বাধীনতা ? কার স্বাধীনতা ?'

সমস্ত শরীর মদে ভিজে গেলে, পাঁড় মাতাল, আকাশের দিকে আমি
উল্টো করে ছুঁড়ে দিই এক ডজন কাচের গেলাস…

তুমি কি ফোটাবে আফিমের ফুল, কলকাতা

তুমি কি ফোটাবে আফিমের ফুল, এই শীতে কলকাতা ?
চারদিকে গভীর কুয়াশা ! মানুষ দেখে না পথ ভোরবেলা
শুধু দুর্ঘটনা ঘটে যায়।
কথা ছিল, তমসা গভীর হ'লে একদিন তুমি
রূপকথার রাজকুমার, জেবলে দেবে আমাদের
জবাকুসুমসংকাশ সূর্য, আগুনের ফুল ! আমাদের
চারদিকে বড় বেশী বিবর্ণ কাপুরুষতা, বড়
নিরাশ্রয় পিছুটান !
ব্রাহ্মমুহূর্তে ছায়ার মত কারা ছেড়ে গেছে ঘর ?
আমরা জেগে ঘুমিয়েছিলাম, কলকাতা ! এখন
এইমাত্র জানি, তারা কেউ ফেরে নি ; শুধুই ভেসে
আসে হরিধ্বনি, বহুদূর থেকে…

সুভাষচন্দ্র

সাক্ষী চন্দ্র, সাক্ষী সূর্য
আর সাক্ষী তুমি ;
নদীর জল হয় না মলিন…

এবং জন্মভূমি।

মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়

মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়
হেঁড়ে গলায় ঘর দুয়ার কাঁপায়।
যখন তারা হাঁক পাড়ে, বাপস্‌রে!
আকাশ যেন মাথায় ভেঙে পড়ে ;
ভয়ের চোটে খোকাখুকুরা হাঁপায়!

মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়···

পৃথিবী ঘুরছে

চোখরাঙালে না হয় গ্যালিলিও
লিখে দিতেন, 'পৃথিবী ঘুরছে না।'
পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও ;
যতই তাকে চোখরাঙাও না।

ভুতপত্রীর দেশে

একটি লাতিন বাক্য মনে রেখে

পাহাড়গুলি কাঁপছে প্রসব যন্ত্রণায়!

এবার তবে জন্ম নেবে
এবার তবে জন্ম নেবে
এবার তবে জন্ম নেবে

কয়েক লক্ষ ধাড়ী ইঁদুর, মানুষখেকো বাঘের চেয়ে ভীষণ!

সূর্য কেন বাদ যায়

গানের পাখিদের
খাঁচায় পুরে,
তাদের হুকুম করা হচ্ছে :
'বলো হে, যুগ যুগ জিও'—

হয়তো একদিন
আকাশের সূর্যকেও
তাঁরা হুকুম করবেন :
'শোন হে ; কান ধরে নীল ডাউন হ'য়ে থাকো।'

মানুষ রে, তুই

মানুষ রে, তুই সমস্ত রাত জেগে
নতুন ক'রে পড়,
জন্মভূমির বর্ণপরিচয় !

পায়ের নিচে তোর
গভীর হচ্ছে চোরাবালির চেয়ে ভীষণ
ঘুমের শূন্যতা ;
তুই
সারাজীবন শিখলি পরের মুখের কথা,
শুধুই কথা !
রাজেশ্বরী জননী তোর তাই উপোসে
রাত্রি কাটায়।

বোঝে না তোর মুখের ভাষা !

নজরুল যে কালে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখেছিলেন

শ্রীসাগর চক্রবর্তী, কল্যাণীয়েষু

লিখেছিস কি যে এক কবিতা
যা নিয়ে পাড়ায় এত হল্লা ?
যাকে দেখি, সেই বলে 'ছেলেটা
ছিল ভাল ; আজ গেছে গোল্লায় ।'

লিখেছিস বটে এক কবিতা
পুলিস করছে তোকে তল্লাশ...

সাঙ্কো পাঞ্জার স্বগতোক্তি

শ্রীযুক্ত তারাপদ লাহিড়ী-কে নিবেদিত

তিনি কথা দিয়েছিলেন,
আমাকে একটি দ্বীপের
গভর্নর করে দেবেন ।

সেই থেকে
আমি তাঁর পিছনে ছুটছি
আর, তাঁর ঘোড়ার, পিছনে
আমার গাধা ।

এই ভাবে ছুটতে ছুটতে
মাঝে মধ্যেই ভয়ানক ক্লান্তি আসে ।
ভীষণ ঘুম পায় !
কিন্তু ঘুমনোর কোনো উপায় নেই ;
কেন না, তিনি সব সময়
আবিষ্কার করেন নতুন কোনো অ্যাডভেঞ্চার—
তিনি, তাঁর ঘোড়া, আমি, আমার গাধা
সবাই তাতে জড়িয়ে পড়ি ।

আর, ওই সময়, আমার সন্দেহ হয়
সমস্ত ব্যাপারটাই আজগুবি—
ঘোড়ার পিঠে তাঁর লড়াই ;
গাধার পিঠে আমার স্বপ্ন।
আমার সন্দেহ আরো গভীর হয়
যখন আমি স্পষ্ট টের পাই
তিনি একজন বদ্ধ উন্মাদ।

এবং এমন কথাও
আমার মনে তখন উঁকি মারে,
একটি দ্বীপের গভর্ণর হলেই
আমার কোন্ স্বর্গ লাভ ?
তাহলে কি আমার চারটে হাত বেরুবে,
অথবা কপালের ওপর আরেকটা চোখ ?

কিন্তু তবু
তাঁর পিছনে আমি ছুটছি
আর তাঁর ঘোড়ার পিছনে
আমার গাধা —
তিনি কথা দিয়েছিলেন ব'লে নয় ;
তিনি একজন নিষ্পাপ, সৎ মানুষ ব'লে...

পূর্ণকুম্ভ মেলায় ভিক্ষুকের গান

একদা মা-কে দিয়েছিলাম দোষ,
'তুমি কেন অর্ধেক-ভিখারী।
না-হয় আমরা ঘরে করবো উপোস ;
তাই ব'লে কি যাবে রাজার বাড়ি ?'

'ছেলে, আমার ছেলে।
ঘটে কুঁড়িয়ে পেট তো ভরে না।
দোষ যদি হয় রাজার বাড়ি গেলে,
ছেলের উপোস দেখবে-কি তার মা ?'

একদা মা-কে দিয়েছিলাম দোষ,
ছিলেন তিনি অর্ধেক-ভিখারী !
এখন আমার রাজার সঙ্গে ভাব ;
কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমার আড়ি।

চলচ্চিত্র

শ্রীসরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

নক্‌শী কাঁথায় ইঁদুর আঁকে রূপসী পাশাবতী,
ঘর ভরতি সোনার মেডেল তার।
পারবে কি রূপকথার রাজকুমার
তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আঁকতে একটি
ইঁদুর-ধরা বেড়াল !

টেলিভিশন : স্বপ্ন

রোজ তারা দ্যাখে টেলিভিশনে খেলা ;
দ্যাখে অলিম্পিকের দৌড়-ঝাঁপ।
তাদের দেশ পায় নি কোনো মেডেল ;
তাদের দেশে খেলার মাঠ নেই...

অলিভার টুইস্ট

'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।'—প্রাচীন প্রবাদ

যেখানে বাঘের ভয় নেই
সেখানেও দিন-দুপুরে বুকে হাঁটা মানুষের ভয় থাকে।
যে রাজ্যে সূর্যাস্ত নেই, সেই বিরাট মানুষের পৃথিবীকে
শিশু তাই এত ভয় পায়।

মাস্টারমশাই

মাস্টারমশাই! আমার পাৎলুনে কাদা লেগে আছে ;
এই দেখুন, কানে হাত দিয়ে বেঞ্চের ওপর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।
দোহাই! ব্যাকরণের ভুল ধ'রে ডাস্টার ছুঁড়ে আর বালকদের কাছে
তিরস্কার করবেন না! রাইটার্স'দের স্কুলে আপনার ছাত্র হয়ে আছি
কবিতার ভাষা শিখতে। কিন্তু ক্লাশে ঢুকতেই পাৎলুনে কাদা লেগে যায়;
কবিতা মাস্টার আপনি, দুহাতে ডাস্টার ছুঁড়লে ধুলো উড়বে
আপনারই গায়ে ..

এ শহর

এ শহরে ঈশ্বরের সভা হবে, তাই
ছেঁড়া কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে পরেছে সে
নকশাপাড় শাড়ি
খোঁপায় গুঁজেছে লাল-নীল ফুল।

রাত ভোর না হতেই ফুটপাতের উলঙ্গ ছেলেরা
বিদেশ গিয়েছে···

শীত-বসন্তের গল্প

শীত বসন্ত দুই ভাই
পথ হারিয়ে বনে গিয়েছে ;
বনের মধ্যে পথ নেই—
ভাই দুটিকে দেখবে এখন কে ?

দেখবে তাদের বসুন্ধরা
দেখবে তাদের বনের পশুপাখি ;
দেখবে তাদের নিষুত রাতে
আকাশ জোড়া মায়ের দুটি আঁখি।

স্থির চিত্র

শ্রীগোপাল মৈত্র, সুহৃদ্বরেষু

সবই তো এক রকম
আমাদের চোর পুলিস স্কুল কলেজ হাসপাতাল,
এই দেশে মানুষের পা রাখার জায়গা কোথায় ?
এখানে শিশুরা আসে জন্মনিয়ন্ত্রণের হুকুম মেনে ;
এখানে বেকার যুবকরা মাইলের পর মাইল
এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের লম্বা কিউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে
এক প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুধার স্পর্ধাকে
তাদের বুকের হাড় আর পিঠের চামড়া খুলে দেয়
যা তাদের বেঁচে থাকার মাশুল।

কিছুই বদলায় না। আমাদের স্বপ্নগুলি
বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকদের মতো
সমস্ত দিন, সমস্ত রাত যাকেই সামনে পায়
তারই পা-জড়িয়ে ভিক্ষা চায় ;
যে দৃশ্য আমরা জন্ম থেকে দেখে আসছি।

তবু আমরা অপেক্ষা করি ; এক মন্ত্রী যায়,
অন্য মন্ত্রী আসে
আমরা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।
আমাদের বুকের ভেতর বোবা শব্দগুলি আর একবার
মুখর হয়ে ওঠে :
'আল্লা ! মেঘ দে ! পানি দে !'
আর প্রতিশ্রুতিগুলি কাগজের নৌকার মতো
বর্ষার একহাঁটু জলে ইতস্তত ভেসে যায়।

ঈশ্বর আমার করমর্দন করলেন

তিনি আমাকে একটা বিরাট প্রাসাদের চূড়া উপহার দিলেন
আর বললেন : এবার আকাশের দিকে হাত বাড়াও ! ঈশ্বর তোমার করমর্দন
করবেন।
তিনি কি বুঝতেন ! যদি তাঁর সামনে আমি উলঙ্গ হতাম
যদি দেখতাম, আমার শরীরে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই।
তিনি কি শুনতেন ? যদি বলতাম, ঈশ্বরকে আমি মোটেই পছন্দ করিনে ;
আমার এখন এক চিলতে মাটির দরকার, যেখানে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে
পারি।
কিন্তু তিনি সেই মহান পুরস্কার সভার পুরোহিত
যেখানে তাঁর কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোন শব্দই উচ্চারিত হয় না।
সেখানে হাজার হাজার পুণ্যার্থী আমার সামনে, আমার পিছনে, আমার
মাথার উপর, আমার পায়ের নিচে....
কী করে ঐ মহৎ জনসভায় আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হবো ?

তিনি কি দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর আকাশস্পর্শী উপহারের প্রচণ্ড ওজন
আমার কাঁধদুটিকে ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে দিচ্ছে ?
তিনি কি অনুভব করছেন, স্তম্ভের প্রচণ্ড ভারে আমার শরীর ধনুকের মতো
বেঁকে গিয়েছে ?...

ভীড়ের চাপে তখন আমি সভার আর এক প্রান্তে ;   অনেক দূর থেকে
তাঁর মুখ এখন কুয়াশার মতো ;
আমার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী এখন অন্ধকার !

আমি বুঝতে পারছিলাম, আর দেরী নেই, এখনই ঈশ্বর আমার করমর্দন
করবেন...

জন্মদিনের কবিতা

আলোক সরকার, প্রীতিভাজনেষু

এইভাবে জন্মদিন আসে, যায়
একা
সে তার রাত্রির ঘুম চোখে নিয়ে
দেখে
ভেসে যাচ্ছে ভাদ্রের কলকাতা

ভোর থেকে নেমেছে বৃষ্টি

তার আগে
গেছে দীর্ঘ বিভাবরী জাগরণে
তার শিবানীর কান্না
বুকে নিয়ে...

ভোর না হতে জ্বর গায়ে
তার রাজেশ্বরী
টলতে টলতে গিয়েছেন
উনুন ধরাতে।

তার ঘরে ঘড়ি নেই

বৃষ্টি থেমে গেছে

এখন আকাশ ভ'রে যাবে রৌদ্রে
একা

তার জন্মদিন, জন্মদিনের দুপুর...

দাউদাউ জ্বলছে উনুন।

শীতের ভিক্ষুক

অসীমকৃষ্ণ দত্ত, কল্যাণীয়েষু

১

এই শহরের নাম 'কলকাতা' দিয়েছে মানুষ।
যারা বানিয়েছে এই শহরের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, তারাও মানুষ।
গীর্জার ঘড়িতে রাত দুপুর; ঘড়ির ভিতর ঘণ্টা বেজে উঠছে—কে
বাজায়?
সেও কি মানুষ? এক অদৃশ্য মানুষ?

২

নির্জন রাস্তায় একা হেঁটে যায় শীতের ভিক্ষুক
সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার অর্ধেক শরীর শুধু হাড়; বাকী আধখানা
ঈশ্বরের নৈবেদ্য।

মানুষ খায় না মানুষ···

তাই সে এখনো হাঁটে কুয়াশার মতো গীর্জা পিছে ফেলে
কখন ঈশ্বর তাঁর কঙ্কালেও বসাবেন হীরায়-বাঁধানো শুভ্র দাঁত?

ফোর্থ ট্রাইবুনাল : একটি সাক্ষাৎ

পিঞ্জরের বাইরে থেকে তাদের হাতগুলি আমি স্পর্শ করেছি
আর অভিভূত হয়েছি তাদের মুখের লাবণ্যে।
যতক্ষণ তাদের সঙ্গে ছিলাম
আমার মনে হচ্ছিল এক আশ্চর্য কবিতার মধ্যে
অনধিকার প্রবেশ করেছি।

আমি অনেক যুবককে একত্র হতে দেখেছি
জলসায়, খেলার মাঠে, সভায়, মিছিলে, মনুমেন্টের নিচে—
কিন্তু কখনও জীবনের ঐকতানকে এত গম্ভীর প্রেমের মতো
অনুভব করি নি।

অথচ আমরা মিলিত হয়েছিলাম আলিপুর কোর্টের
গম্ভীর বিচারশালায়
যেখানে বাতাসকেও মাথা নিচু ক'রে, সাতবার কুর্ণিশ ক'রে
ভিতরে ঢুকতে হয়।

সেখানে তারা আসামী ; বছরের পর বছর চলছে তাদের বিচার !
ঐ দীর্ঘ সময় তাদের কেটেছে থানার লক্ আপে,
পুলিসের অকথ্য নির্যাতনে
এক জেল থেকে আর এক জেলে ; কখনও হাতে শিকল, পায়ে বেড়ি !
বছরের পর বছর তাদের জন্য বেজেছে 'পাগলী' ঘন্টা...
আর, এই মুহূর্তে, আদালতের ভিতর তাদের এক হাত শিকলে বাঁধা ;
অন্য হাত তারা বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে, স্বাধীন মানুষের দুই
হাত স্পর্শ করছে তারা।

বছরের পর বছর ভারতবর্ষের মতো এক সভ্য দেশ তাদের
বিচারের নামে বন্দী ক'রে রেখেছে ;
কবে যে সেই বিচার শেষ হবে, কেউ জানে না।
বছরের পর বছর জেলের বাইরে আমরা সহ্য করেছি স্বাধীনতার নামে,
স্বদেশের নিরাপত্তার নামে
মানুষের অপমান ! তার পাপে, আত্মগ্লানিতে আমরা বামনের মতো
কুঁকড়ে গেছি ; কুঁজো হয়ে রাস্তা হেঁটেছি।

কিন্তু ঐ পাপ তাদের স্পর্শ করে নি ! তাদের শৃঙ্খলিত হাত আমাকে
জানিয়ে দিচ্ছিলো,
জেলের ভিতর তারা গান গায়, তারা হাসে ;
তারা প্রতীক্ষা করে, দিন আসবে।
তাদের হাতের ছোঁয়ায় আমার শরীরের রক্ত চলাচল
ক্রমেই দ্রুত থেকে আরও দ্রুত হচ্ছিলো ;
নিজেকে পাখির মতোই হাল্কা মনে হচ্ছিল আমার।
আমি বুঝতে পারছিলাম, পবিত্র হচ্ছি, সুন্দর হচ্ছি,
আমি এক আশ্চর্য কবিতার মতো হয়ে যাচ্ছি
যা আমার চৈতন্যের চেয়ে গভীর, যা মানুষের মনুষ্যত্ব, যা জীবন...

চতুর্দিকে স্বদেশ

আলো জ্বললে স্বদেশ,
অন্ধকারও স্বদেশ।
মন্ত্রী যখন ন্যাংটো ছেলের কান ম'লে দেন
বুঝতে পারি,
চতুর্দিকে সভা করেছে স্বদেশ !

পুলিশ দিয়ে

পুলিশ দিয়ে অন্ধকারকে করা যায় না আলো,
অন্ধকার যে তোমার নিজের ঘরে।
পুলিশ বাইরে পাহারা দেয়, ঘরের মধ্যে তুমি
ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখছো, আলো নিয়েছে চোরে।

বাইরে গাছের পাতা ঝরছে, তাতেও তোমার নালিশ,
ঐ বুঝি কেউ আলো নেভায়, শুনছো পায়ের শব্দ।
ঘুমের মধ্যে দারুণ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠছো —'পুলিশ'!-
যেন পুলিশ অন্ধকারকে করবে দারুণ জব্দ!

তোমার ঘরের পিদিম কখন আপনি গেছে নিভে,
অন্ধকারের সঙ্গে তোমার লড়াই শুধু জিভের।

নিষিদ্ধ বর্ষণ

বৃষ্টি নামে নিঃশব্দে

ভেজা বাতাসে ফুলের দীর্ঘশ্বাস

ঘুম থেকে স্বপ্নে
জাগরণ...

ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে
ঘর ফুটপাত
আহার বাতাস,
ন্যাংটো ছেলেটা
দেখছে আকাশ।

সেখানে এখন
টেক্কা সাহেব
বিবি ও গোলাম—
রাজ্যের তাস

সবাই ব্যস্ত;
সবাই করছে

চাঁদ সূর্য ও
তারাদের চাষ ;

সবাই চাইছে
রাজত্ব, আর
সবাই লিখছে
দারুণ গল্প।

সেই শুধু ফুট-
পাতের ন্যাংটো
ছেলে, তাই তার
বুদ্ধি অল্প—

দূর থেকে তাই
দেখছে দৃশ্য
দেখছে এবং
দিচ্ছে সাবাস !

'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে

নাতি বাঁধছে তার দিদিমার চুল
খুঁজছে, কোথায় লুকোনো তার প্রাণ—
'কোথায় আছে আইমা, তোর পরাণ ?'

'ক্যান রে নাতি ? ক্যান ?'
'কেউ যদি নেয় চুরি করে ? আমার বড্ড লাগে ডর !'
'ভয় নেই তোর নাতি, আছে দিঘির ভেতর আমার
পরাণ—

এক ডুবে যে আনতে পারবে, এক কোপে যে কাটতে পারবে
আমার মৃত্যু তার হাতে। নেই এমন মানুষ পৃথিবীতে,
—আমার জন্য ভয় করিসনে তুই।'

রাত নিঝঝুম, সব নিজঝুম! গভীর জলে ঝাঁপ দিয়েছে নাতি—
দিদিমা তার মানুষ নয়, রাক্ষসী! ..

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস: এই বাংলাদেশ

যে কবি তাঁর মনুষ্যত্বে
অটল ছিলেন সর্বনাশে,
তাঁর চিতায় মঠ দিতে কেউ
ছিল না এই বাংলাদেশে।

যাঁরা ছিলেন দেশের মানুষ,
তাঁদের তখন অনেক কাজ...

তোমার কাছে

তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি আমি,
যদিও অনেক দেরী হলো।
তোমার মাথার সমস্ত চুল এখন সাদা;
আমিও আর শিশুটি নেই, তোমার পায়ের শুকনো পাতা
চোখের জলে ধুয়ে দেবো!

কী করে যে ক্ষমা চাইবো? তোমার মাথার সমস্ত চুল
এখন সাদা;

এই কী ক্ষমা চাওয়ার সময় ! অথচ দূরে ঘন্টা বাজছে,
আর দেরী নয় — যেতেই হবে।
আর দেরী নয় — অথচ কত বছর তোমার মুখ দেখি নি!
কত বছর চোখের জলে তোমার পায়ের ছায়া পড়ে নি,
কত বছর...

'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে'

একটি পুরানো রূপকথা

একটি মেয়ে উপুড় হয়ে কাঁদছে যন্ত্রণায়
বিবর্ণ তার নয়ন দুটি, কিন্তু বড় মিঠে।
একটি ছেলে জানে না, তাই অঘোর নিদ্রা যায়
জানলে পরে থাকতো এখন পক্ষীরাজের পিঠে।

বিশ বছর আগের একটি বিকেল
খিদিরপুরে উড়ছে ঘোড়া
দাঁড়িয়ে দেখেন মানিকবাবু ;
পকেটে তাঁর তিন টাকার এক
আলাদীনের টিকেট।

ভাবেন তিনি কী মজা
কাল ফকির, আজ রাজা
জানেন না তো তাঁর ঘোড়াটি
করেছে আজ পিকেট !

এই আলাদীন আসল না—
ভাবতে ভাবতে মানিকবাবু
যেই ঘোড়াকে ধমকে দেবেন,
'কেন উড়লি না ?'—

ঘড়িতে বাজে ঢং
ঢং ঢং ঢং ঢং !
বেজে বেজেই থামলো ঘড়ি ;
কেউ দিলো না রা !
এক পায়ে এক ফুচকাওলা
দাঁড়িয়ে আছেন গাল ফুলিয়ে ;
আর রয়েছেন মানিকবাবু
বনমানুষের ছা ;
"তাইরে নাইরে, না
পকেটে নেই একটাও পয়সা !"

পবিত্রদা

আশি বছর পার তো হ'লেন, পবিত্রদা। আমরা যে
হাবুডুবু খাচ্ছি এখন পঞ্চাশে।
আপনি শিখেছিলেন সাঁতার তুফান নদী পার হ'তে
আমরা যে
ঘোলা জলেই তলিয়ে গেলাম মাঝপথে !

আর কী শেখা যায় সাঁতার ? এখন যে
দিগ্বিদিক অন্ধকার ; ছড়িয়ে আছি কোথায় কে !
অনেক দূরে একটি মুখের ছবি, মাথার চুল সাদা—
উনিই কি পবিত্রদা !

ছিলেন কাশীর সুরেশবাবু,
ভাঙতেন, মচকাতেন না—
কোথায় গেলেন ? মাঝদরিয়ায় কাউকে কি আর
পায়ে ধ'রে যায় সাধা ?

স্বপ্নে দেখি হেঁটে চলছেন একটি মানুষ, সোজা কোমর,
আশি বছর কিছুই না।

জীবন ! আমার জীবন

কিরণশঙ্করকে

ঘাটে দিলেন পা ;

চারদিকে তাঁর
চলছে তখন
দারুণ তামাসা !

সবার হাতেই
মস্ত নরুণ ;
সবাই বলছে,
'আজ্ঞে করুন।'

একা তিনি
বনমানুষের ছা।
ভাবেন তিনি
কোথায় এলাম ?
কেনই বা আর
বাঁচতে গেলাম !

চারদিকে যা
দেখছি, এ-তো
ডাকাতদের সভা !

'ভুল করছেন !
আমি শুধুই
বনমানুষের ছা—

এই বয়েসে
এত ফুর্তি
সহ্য হবে না !'

'ঐটি হবে না—

ষাট পেরোলেই
সভা হবে ;
সভাপতির
ভাষণ হবে ।'

'জীবন ! আমার
জীবন ! কেন,
শব্দ করছো না ?'

কেউ দিলো না রা !

প্রত্যাবর্তন

একটি গাছ
মাটিতে ফিরে যাচ্ছে
কিন্তু, একদিনে না
এক বছরেও না।

সে ভেবেছিল
মাটিকে ছাড়িয়ে
অনেক ঊর্ধ্বে যে আকাশ,
তাকে স্পর্শ করবে—
কঠিন মাটি
তাই সহজে
তাকে ঘরে ফিরতে দেবে না....
বছরের পর বছর
তাকে অপেক্ষা করতে হবে
আর, দিন নেই রাত নেই
তাকে নতজানু হতে হবে
রোদ, জল আর বাতাসের কাছে ;
যেন তারা মাটির কাছে
তার হ'য়ে কথা বলে।
একদিন, তারাই তো
তাকে আকাশে মাথা তোলার
স্বপ্ন শিখিয়েছিল ;
সেই সব সূর্যকরোজ্জ্বল দিন,
আর, কালপুরুষ সপ্তর্ষির মন্ত্রে জ্বলে ওঠা

আশ্চর্য রাত
তার অনেক দেখা হ'য়ে গেছে।

একদিন সেও
যৌবনকে পেয়েছিল,
তার সমস্ত অঙ্গ
সেদিন নেচে উঠেছিল
ঝড়ে, বৃষ্টিতে
বেঁচে থাকার আনন্দে।

আর, সব ঝড় শেষ হয়ে গেলে
বৃষ্টি থেমে গেলে
মধুর আকাশের শান্ত যামিনীতে
হাজার হাজার নক্ষত্রের গানে
বাঁশির মতো বেজে উঠেছিল সে।

যদি তার পাখা থাকতো
হয়তো পাখির মতোই
সেদিন সমস্ত আকাশটাকে
চুমু খেয়ে
সে তার প্রেম নিবেদন করতো,

তার পাখা ছিল না
কিন্তু সেজন্য
তার কোনো গভীর দুঃখ নেই ;

সে যদি পাখি হ'তো
তা হ'লে এক জন্ম থেকে
অন্য নবজন্মে
সে কি মাটিকে এত বেশী নিজের ব'লে

অনুভব করতো ?—
যা তার ধর্ম :

একদিন মাটিকে বিদীর্ণ ক'রে
সে ঊর্ধ্বে তার হৃদয়কে প্রসারিত করতে চেয়েছিল;
যদিও তার শিকড়
কোনোদিন মাটিকে অস্বীকার করে নি।

আজ
তার এক জীবনের কাজ শেষ হ'য়ে গেলে
সে মাটির কাছে সম্পূর্ণ নত হ'য়েছে

কিন্তু মাটি
এত সহজে তাকে ফিরিয়ে নেবে না—
বছরের পর বছর
শতাব্দীর পর শতাব্দী
তাকে অপেক্ষা করতে হবে

তারপর
হয়তো সে একদিন
মাটির গভীরে
আলো হবে
যা তার
কোটি বছরের কঠিন তপস্যার

পুরস্কার।

৮

এক যে আছে মানুষখেকো
কেবল বলে : আমায় 'দ্যাখো।'
তোকে দেখব কি
মানুষ খেয়ে বাঘ হয়েছিস। আরে ছিঃ! ছিঃ!

১২

ওরাং ওটাং-এর শ্বশুর,
একটিই তার কসুর—
জামাইটি তার অসুর।

১৬

কুমায়ুনের বাঘ
হুমায়ুনের কে?
এত যে তার রাগ,
বাদশা নাকি সে?

১৮

কেন রে উট
খায় ডালমুট?
কেন নেকড়ে
খায় কেক রে?

১৯

'কেন রে হুলোর পিঠে কুলো
কেন রে হুলোর কানে তুলো?'
হুলো যাবেন এ্যাসেম্ব্লীতে
টরেটক্কার ভাষণ দিতে।

২০

কোলা ব্যাঙের ছা
কথা বলেন না।
কথা বললে ভাঙবে ধ্যান,
তিনি শুধুই ভাষণ দেন।

২৪

ঘরের মধ্যে চড়াই
কেবল করে বড়াই—
বড় গামা, ছোট গামা
দুজনেই তার মামা।

২৭

জাগুয়ার
খাবেন না সাগু আর।
রোজই বলেন মেজদি-কে,
খাবেন তিনি শেঠজি-কে।

২৯

টিকটিকি
বলেন ঠিকই
উটের মাথায়
নেইকো টিকি।

৩০

'টুনটুনি
আসল খুনী!'
'থামা প্যাঁচানী
তোর চ্যাঁচানী!
দারোগাবাবুর
শ্বশুর উনি।'

৩৭

নেকড়ে
ধরেছেন এক ভেক্‌ রে!
গায়ে নামাবলী কপালে ফোঁটা;
হাতে নিয়েছেন মস্ত লোটা।

৪১

পিঁপড়ে

ভাঁড়ার ঘরে কি করে ?

এটা খায়, ওটা খায় ;

পিঁপড়েনীকে গান শোনায়।

৪৪

বাঘ বলে 'বাঘিনী।

একটুও রাগি নি

শুনে, তোর দাদা নেই।

আমি শুধু রেগে যাই

যখন শুনতে পাই

চিড়িয়াখানায় কোনো গাধা নেই।'

৪৬

ভোট দিও না হাতি-কে

ভোট দিও তার নাতি-কে।

ভোট দিও না গাধা-কে

ভোট দিও তার দাদা-কে।

৪৮

মানুষ খাবি মাগনা !

কেন রে, তুই বাঘ না ?

পয়সা নেই তো ভাগ না !

৪৯

রাত দুপুরে তিনটে বানর

কেবল বলে, 'পকেটে পোর।'

'কাকে রে কাকে ?'

'—সূর্যটাকে।'

৫২

সিংহের মামা ভোম্বলদাস
বাঘ মেরেছে গোটা পঞ্চাশ।
চারদিকে তাই, 'সাবাস! সাবাস!'
ভোম্বল হাসে আর খায় ঘাস।

৫৩

হাড়গিলে
পাড়াপড়শীর হাড় গিলে
চলেছেন আজ কার বাড়ি?
কে করবে তাঁর ডাক্তারী!

৫৪

হুলো বলেন, 'হুলোনী
দুঃখের কথা ব'লো নি—
রাত বেজেছে বারোটা,
বাবুরা খান পরোটা।'

তিনটি প্রেমের কবিতা

১

সেদিন আমার শত্তুরের মুখে রোদ্দুর দেখে
বুকের ভেতর কান্না আমার—কী হলো তার? সে
নেচে উঠলোঃ 'কেমন মজা! কেমন প্রতিশোধ!'
—অবাক ক'রে আমার প্রতিরোধ!

২

সন্ন্যাসীকে বলেছিলামঃ
'তুমি কুষ্ঠরুগীর মুখে
চুমু খাওয়ার গল্প জানো,
কিন্তু তাতে কার আরোগ্য?
তাকে শীতে কাঁপতে দেখে
খুলে দিয়েছ তোমার বসন!
তুমি তো উলঙ্গ হলে
তাতেই বাঁচবে হতভাগ্য?'

৩

দেখেছিলাম নগ্ন তিনি
হেঁটে যাচ্ছেন সন্ধ্যাবেলা,
শিশুরা তাঁকে ঢিল ছুঁড়ছে
তিনি হাসছেন, এ কোন্ খেলা !

বন্ধুরা তাঁর দারুণ ক্রোধে
ছুঁড়ে দিচ্ছেন গাত্রবাস,
তাঁরা কি জানেন, কোথায় তিনি
শুয়ে থাকবেন রাত্রিবেলা ?

প্রজাপতি, যখন তুমি উড়ে যাও
কোন্ রঙটা তোমার ?
তুমি যখন সামনে দিয়ে উড়ে যাও
নীল

আবার লাল
কখনও বা বরফের মতো সাদা
তোমার শরীরে তখন সূর্যের আলো
ডানা মেলে দেয়
রঙ উড়তে থাকে, নীল
আবার চোখের পলকে
হলুদ,
লাল ! আমি ছুঁয়ে দেখতে ভয় পাই

যদি রঙ
আমার আঙুলে লেগে পাথর হয়ে যায় !

তার চেয়ে
তুমি যেমন উড়ে যাচ্ছো
যাও,

আকাশের দিকে…

তিন পয়সার অপেরা

কিনবি কি তুই তিন পয়সায়
দুই পয়সায়, এক পয়সায়
আমার আলাদিনের পিদিম কবিতা ?

তুই বললি : 'না !
এক পয়সার এখন অনেক দাম
দুই পয়সা থাকলে তামাম পৃথিবী কিনতাম !'

হায়রে আমার স্বপ্ন, আমার মাঘরজনীর সবিতা !
তিন পয়সায় দিয়ে দিতাম
দুই পয়সায় দিয়ে দিতাম
এক পয়সায় দিয়ে দিতাম—

তুই বললি : 'না !'
ওরা বললো : 'না !'
সবাই বললে : 'না !'

তিন পয়সায় এখন নাকি কিনতে পাওয়া যায়
তিন ভুবনের যেখানে আছে যা ।

ঘরে ফেরা

যদিও রাত রূপসী, আজ উন্মাদিনী, তোর
ঘরে ফেরার দুয়ারে দেয় কাঁটা—
কিন্তু তোকে ফিরতে হবে, কেন না প্রেম কতো গভীর
নিষ্ঠুরতা, তুই
জানলে আর কবিতা লিখবি না।

নেই বৃষ্টি

নেই বৃষ্টি কলকাতার
চক্ষু যেন করমচা!
বাবুরা খান গরম চা
টগবগিয়ে ফুটতে...

এ ওর গায়ে রাখেন পা:

ছুটতে ছুটতে ছুটতে
পাগলা ঘোড়া শহর
কুড়িয়ে পেলো ফুটপাথে
চকচকে এক মোহর!

জল দাও

তোমার সঙ্গে অনন্তকাল ঝগড়া ছিল, সারা সকাল
চোখের আড়াল বুকের আড়াল
সারা দুপুর রৌদ্র শুধু মাথার ওপর!

মাথার ভেতর টগবগিয়ে রক্তগুলি,
একশো ঘোড়ার পায়ের শব্দ,
পাহাড় পেলে গুঁড়িয়ে দেয় এমন ভীষণ!

তোমায় দেখলে সমস্ত মুখ ফ্যানায় ভাসতো,
ঘোড়াগুলি থামতে গিয়ে সামনে পিছে ডানে বয়ে
এ-ওর গায়ে চড় কষাতো ; একশো ঘোড়া
মদ না খেয়ে সবাই মাতাল, মদ না খেয়েই,
তোমার পাপে !
সেই সুবাদে ঝগড়া ছিল। ভর সন্ধ্যায়
তোমার গলার আঁচল ছিঁড়ে, তোমার হাতের প্রদীপ ভেঙে
তোমার প্রার্থনাকে আমি ইতর ভাষায় চৌদ্দপুরুষ
নরক করবো, ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাদশাজাদা আমার
হারামজাদা পরমেশ্বর
বুকের ভেতর, মাথার ভেতর, শিরা উপশিরা রক্ত
হৃৎপিন্ডের ভেতর কেটে
এলোপাথাড়ি চাবুক হাঁকায় ! টলতে টলতে তোমার
সামনে নতজানু
যন্ত্রণায় কোনো কথাই থাকে না, শুধু রক্তে ভাসে একটি শব্দ
'জল দাও ! জল দাও !'

আধখানা চাঁদ

আধখানা চাঁদ বিকার বলে
হাসপাতালে।
মেঘের গাড়ি কাদায় ঠেকে, চাকাগুলি
ক্রমেই ডোবে ;
কাঁধ দেবে কে ? কালপুরুষ
রংরুটে নাম লিখিয়ে হাওয়া ; সপ্তর্ষির
একজনেরও সময় নেই।
সময় একটি নষ্ট ঘোড়া,
কেবল পালায় !

তার ওপরে, আজ এ-বাড়ি কাল ও-বাড়ি
আছে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের পালা। নইলে
অরুন্ধতীর ভাতের হাঁড়ি
শিকের ওপর ঝুলতে থাকবে, যেমন ঝোলে
তোমার ঘরের আমার ঘরের হাজার নারী
স্বর্গে যাবার খেল দেখাতে।

দেখতে দেখতে চাঁদ
হিম হয়ে যায় হাসপাতালে!
এখন শুধু খাটে তোলা, কাঁধ মেলাবার
দু-চার জন—
ডাক্তারের পায়ের তলায় উপুড় হয়ে কুড়িয়ে আনা
বিনি পয়সার সার্টিফিকেট……

ভালবাসার কবিতা

১

ভালবাসা
যেমন গান
যেমন আকাশ

কিংবা
কোনও শব্দ নেই
ছবিও নেই

২

ঝড় উঠলে
ঘরে বাইরে
বাতাস

তখন
ঘুমপাড়ানী গানের
শান্ত আগমনী
আগুন !

তখন তোমার মুখ
দেখা যায় না

ছোঁয়া যায় না !

শব্দগুলি

শব্দগুলি ছুঁড়ে দিয়েছ পাথরে। পাথরে তারা না গান,
না কান্না। শুধু ইতস্তত আগুনের ফুলকিগুলি,
নাকি রক্ত, লাল আর কালো অন্ধকারের ভিতর...

তারপর আর কিছুই দেখা যায় না, আর কিছুই
শোনা যায় না। শুধু পাথর যা এখন নিঃশব্দ,
শুধু আগুন যা এখন অদৃশ্য...আর, তোমার সর্বনাশ
আমার ভৌতিক জটায় বেঁধে নিয়ে আমি এই রাস্তায় ঐ রাস্তায়
খুঁজে বেরাচ্ছি একটা অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া
আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ !

প্রবাহিত জীবন

ভালবাসার কান্নাগুলি
নির্বাসনের একাকীত্বে...

ভিক্ষা চাইবে ?
দেবার মানুষ নেই !

শুধু কি বয়েস গেছে

শুধু কি বয়েস গেছে ? আমার কবিতা
আমাকে বিষণ্ণ করে বিদায় নিয়েছে।
সে বড় একাকী ছিল। আজ আমি একা।

চারদিকে নৈঃশব্দ্য শুধু! আহ্লাদিত অন্ধকার
মন্ত্রীত্ব পেয়েছে।

নির্বাসন : স্মৃতি : বিস্মৃতি

কোটি বছরের এই দেখা
এই পাথরের মতো মাটি

পাথরের মতো মানুষ !

বুক ছুঁয়ে যায় যার মুখ, সে-তো
একটি শীর্ণ বাতাসের নিঃশ্বাস !

ক্রমে ছায়া দীর্ঘ হয়

ক্রমে ছায়া দীর্ঘ হয়
ক্রমে
ছায়া দূরে সরে যায়।
দূরে
অন্ধকার হয়ে আসে
গাছ, পাখি,
মানুষ।

পৃথিবী তার
ঘুমের গল্পকে কোলে নিয়ে
স্বপ্ন দেখে
পাতা-ঝরা গাছের...

বেশ্যালয় থেকে চোর

বেশ্যালয় থেকে চোর চুরি ক'রে নিয়ে যায় মাটি।
কে তাকে বলেছে ধর্ম, সেই থেকে হয়েছে সুমতি—
ঈশ্বরের আশীর্বাদে প্রতি রাত্রে বেশ্যা হয় শিবের পার্বতী।

ভাবে চোর, ধর্মে থাকলে একদিন তার সঙ্গে মহাদেব
খেলবেন কপাটি।

বানভাসি

পাপ থেকে তুই পুণ্য কুড়াস
পুণ্য থেকে তীর্থে যাবার মাসুল ;
লঙ্গরখানার খিচুড়ি খাস
গঙ্গা যখন ছিঁড়ে নেন তোর বউয়ের কানের দুল !

গঙ্গার নেই পাপ-পুণ্যের বালাই...
দেখলে তাঁকে, দেখলে তোকে ইচ্ছে করে এদেশ
থেকে পালাই।

আঁধার যায় না

আঁধার যায় না। এক মন্ত্রী যায়, অন্য মন্ত্রী আসে
কবির সভায়। তারা কবিতা পড়ে না, তবু
তারা কবিতার সারাৎসার
ব্যাখ্যা করে। আঁধার যায় না। শুধু জন্মদিনে
কলকাতার আকাশে বাতাসে
ভূতুড়ে আলোর মতো ছায়া ফেলে মাননীয় মন্ত্রীদের
মুখের বাহার !

ভাগ্যে ছিলেন তিনি

ভাগ্যে ছিলেন তিনি
তাই ভোট দিয়েছি তাঁকে।
তিনিই যদি না থাকতেন
দিল্লী যেতো কে ?

কয়েকটি দুঃস্বপ্ন

রূপসী রাজনীতি

রূপসী তুই রাজনীতি, দিস
ছেলে-ছোকরার মাথা ঘুরিয়ে ;
কিন্তু বুড়ো-শয়তানদের
সঙ্গে থাকিস রাত্রে শুয়ে।

ভূতের গল্প

এপার বর্ষা ওপার খরা
মধ্যে নদী লক্ষ্মীছাড়া ;
ভূতের মতো হাঁটছে মানুষ
লঙ্গরখানায় যাচ্ছে যারা।

শিশুবধ

শিশুরা যায় হাটে
শিশুরা যায় মাঠে ;
দিনদুপুরে তাদের বাবা
মায়ের গলা কাটে।

মুঠো খালি রাখতে নেই

মুঠো খালি রাখতে নেই।

ফুল-বেলপাতার কাজ শেষ হয়ে গেলে
হাতের কাছে যা পাওয়া যায়
পাথর, ধুলো, একটা মরা ইঁদুর—
তাই আমরা আমাদের জাগ্রত শালগ্রাম-শিলাদের জন্য
দু-হাত ভর্তি ক'রে নিয়ে আসি।

তাঁরা প্রসন্ন হন!

জননী জন্মভূমিশ্চ

১

যিনি চলে গেলেন
তাঁকে ম্লান মুখেই চলে যেতে দিয়েছি;
সেজন্য আমার ভিতরে কি
কোনো গভীর বেদনা আছে?

মানুষ নামের এক রকম পাথর,
তাতে আলো পড়ে না
অন্ধকার নড়ে না
কিছুই হয় না...

মাঝে মধ্যেই মনে হয়
আয়নার সামনে কেউ দাঁড়ালে
শুধু আয়নাটাই কথা বলে।
কী যে বলে, তা শুনবার মানুষ
আজ আর আমি খুঁজে পাই না।

২

আমার জন্মভূমি,
আমি অনেক দিন তাঁকে দেখি না
তাঁর কোনো খবর রাখি না।
তিনি কি এখনও কুয়াশায় কাঁথামুড়ি দিয়ে
আগের মতোই নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে আছেন?

আমার ছেলেবেলায়
যেমন তাঁকে দেখেছিলাম,
শীর্ণ দুটি হাত ঘুমের ভেতর কেঁপে কেঁপে উঠছে!

নাকি অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গেছে
পাখি ডেকেছে, ফুল ফুটেছে।
তারপর বাঘের মতো এক দুপুর এসে আমার মায়ের
পাড়া-জ্বালানো ছোট ছেলেটাকে...

তার কোনো চিহ্নই আর পাওয়া গেল না,
নদীর এপারে না
ওপারে না।

হয়তো সে আমার নিজের ভাই ছিল না,
কিন্তু তাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।
চারদিকে এখন কত ফুল, কত পাখি...
হয়তো এভাবেই একদিন দুপুর গড়িয়ে
বিকেল আসে!

তারপর সন্ধ্যা নামবে, রাত গভীর হবে—
আমি তখন পাথরের মতো ঘুমুবো।

জন্ম, পুনর্জন্ম

কঠিন থেকে কঠিনে তার উত্তরণ
যতদিন না পথের শেষ হয়।
সেখানে নিঃসঙ্গ মানুষ দেখে জীবন আর মরণ
এক হয়েছে আলিঙ্গনে। সামনে জ্যোতির্ময়
নবজন্ম কাঁপছে! দূরে নদীর মতো রক্তধারা
পাহাড় থেকে সমতটের দিকে
মিলিয়ে যায়। ভোর হচ্ছে·· ভোর হয়েছে। তবু সে তার
বুকের মধ্যে আদ্যিকালের প্রেমের প্রশ্নটিকে
মলিন দেখে, গভীর বিস্ময়ে
ভাবছে আরও কত পাহাড়, পাহাড়ের পর আবার পাহাড়,
একা থেকে আরও কঠিন একা···

এই যুদ্ধ

শুভ হোক তোর ললাট, কুশল

হোক তোর স্তনচূড়া,
হোক রাঙা আবিরের মতো লাল
সন্ধ্যাব শত্রুরা।

ভরুক পেয়ালা রাত্রি গভীর হলে,
বুকের ভিতর যায় যদি যাক জ্ব'লে,
শুভ হোক তোর খুনে-আগে রাঙা কুশল...
ঘরে মাতলামো, বাইরে ঝড়-বাদল:

শান্তি তো অপদার্থের, তুই
মৃত্যুকে নিবি কোলে।
শুভ হোক তোর ললাট, কুশল
এ-যুদ্ধ শেষ হলে....

রাস্তায় যে হেঁটে যায়

(বিদেশী কবিতার অনুসরণে)

মৃত মানুষেরা— তারা আমাদের মধ্যে থাকে। তারা
বাড়তে থাকে—বাড়তেই থাকে।
আমার কিশোর ভাইয়েরা, সারা শরীরে গান নিয়ে
মৃত—তারা আমাদের মধ্যে থাকে।

যখন রাত ভোর হয়, আর যখন সূর্য আমাদের
মাথার ওপর
তারা একের পর এক বাইরে আসে।
আমাদের কোনোরকম সম্ভাষণ না জানিয়ে,
কারুর শরীর স্পর্শ না ক'রে
তারা এগিয়ে যায়—যেখানে মাদল বাজে —যেখানে
নাচের তালে তালে
মানুষের কপালে হাওয়া লাগে। তারা এগিয়ে যায়
সারা শরীরে গান নিয়ে।

তারা সবাই হেঁটে যায়, একজনের পিছনে
আরেকজন—
সেইসব দ্রুতগামী কিশোরেরা। মৃত। একজনের
পিছনে আরেকজন।